সম্পাদক
ড. শ্রীরবীন্দ্রনাথ সরকার

নির্বাহী সম্পাদক
শ্রীজগদীশ দেবনাথ

সম্পাদনা সহযোগী
শ্রীতাপসকুমার রায়
tapas.satsang@gmail.com
tkroy@rocketmail.com

ঢাকা কার্যালয়
১৪০/১ শাঁখারী বাজার
ঢাকা-১১০০ ।

চট্টগ্রাম কার্যালয়
২৭ দেওয়ান্‌জী পুকুর লেন
রহমতগঞ্জ, চট্টগ্রাম ।
ফোনঃ ০৩১-২৮৬০৭১১
মোবাইল: ০১৭১৪-৩১০২০৩
০১৮১৯-৩১২৫১৮

প্রধান কার্যালয়
শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্র সৎসঙ্গ
হিমাইতপুর-পাবনা
ফোনঃ ০৭৩১-৬৫৫২৩, ৬৫১৬৪
মোবাইলঃ ০১৭১৫-৫৩৪২০৭ (সম্পাদক)
০১৯১১-৭৮৮১৩৯ (সম্পাদনা সহযোগী)
০১৭১৮-১৫২৩৪৪ (অফিস)
E-mail: satsanghimaitpur@yahoo.com

বাণিজ্যিক যোগাযোগ
শ্রীঅনিশচন্দ্র ঢালী
০১৭১৯-৭৫৩৪৭৪

প্রচ্ছদ ও পৃষ্ঠা সজ্জা
আমিনুল ইসলাম
প্রিন্ট মিডিয়া, প্রেসপট্টি, বগুড়া

সন্দীপনা

ই ষ্ট বা র্তা বা হী সা হি ত্য - মা সি ক

৪৩বর্ষ, ৮ম সংখ্যা, ফাল্গুন ১৪২৩ বঙ্গাব্দ, ফেব্রুয়ারি-মার্চ '১৭ খ্রিঃ, শ্রীঅনুকূলাব্দ ১২৯

কা'রও প্রতি কোন ক্ষোভ
কা'রও ব্যবহারের দুষ্ট সংঘাত, অপমান, অমর্য্যাদা
তোমাকে যদি তা'র প্রতি
বিরুদ্ধ বিক্ষোভিত
বা ঘৃণার্হ দ্রোহ-আলম্বিত ক'রে রাখে–
তা'র নিরসন নিরাকরণে
তুমি যদি অসমর্থই হ'য়ে থাক,
ঐ ক্ষোভপ্রসূত অলীক-ধারণার অনুবর্ত্তনায়
তুমি যদি নানাপ্রকারে দুরপনেয়
দ্রোহচিন্তাফলক সৃষ্টি ক'রেই চ'লতে থাক–
দেশ, কাল,পাত্র, অবস্থা
ও স্বভাব-অনুপাতিক বুঝ নিয়ে
তা'কে পরিশুদ্ধ না ক'রে,–
দেখবে কোন্ দিন কোন্ ফাঁকে
কোন্ বিপর্য্যয়ের হাতে প'ড়ে
কোন্ বিড়ম্বনাতেই যে তুমি নিপীড়িত হবে
তা' কিন্তু কিছুই বলা যায় না,
কোথাও অমনতর কিছু হ'লে
অতি সত্ত্বরই নিরাকরণ ক'রে ফেলো তা'কে–
একটা অনুকম্পী হিতী-আগ্রহের সৃষ্টি ক'রে,
অনেক রেহাই পাবে । (সদ্‌বিধায়না-১৩৪)

–শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্র

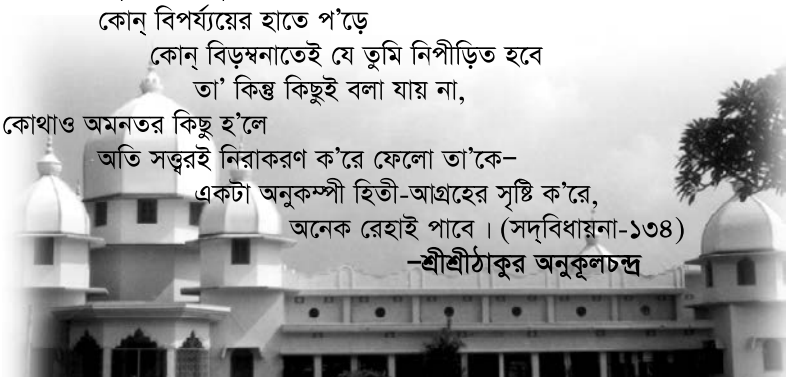

সূচিপত্র

প্রণিপাতেন পরিপ্রশ্নেন সেবয়া ৪
দিব্যবাণী ঃ শ্রীশ্রীঠাকুর ৭
মাতৃদীপনা-সেবা-বিধায়না ঃ শ্রীশ্রীঠাকুর.....৯
ছন্দে ছড়ায় জীবন আলো ঃ শ্রীশ্রীঠাকুর ১১
শিশুকথাঃ শ্রীদেবীপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় ১৩
মানসতীর্থ পরিক্রমা ঃ সুশীল চন্দ্র বসু ১৪
প্রেমল ঠাকুর ঃ প্রলয় মজুমদার ১৭
আমি তোমাকে ভালোবাসি ঃ জগদীশ দেবনাথ ২১
স্বামী বিবেকানন্দের যোগ্যা শিষ্যা নিবেদিতা ঃ ড. প্রজ্ঞারঞ্জন দত্ত ২৪
গান/কবিতা.....২৮
চিরঞ্জীব বনৌষধী–ক্ষুরক(কুলেখাড়া)ঃ আয়ুর্ব্বেদশাস্ত্রী শ্রীশিবকালী ভট্টাচার্য্য ..২৯
প্রার্থনার সময়সূচি ৩২

অনলাইনে 'সন্দীপনা' পড়তে ভিজিট করুন–
www. srisrithakuranukulchandrasatsang.com/pages/publications

সম্পাদকীয়

শিউলি-সুঘ্রাণ মাখা একমুঠো ধুলি

"প্রভু আমার, প্রিয় আমার পরম ধন হে!
চিরপথের সঙ্গী আমার চিরজীবন হে ॥"

প্রভু– প্রকৃষ্টভাবে যিনি হয়ে উঠেছেন– তিনি প্রভু। যিনি সহজেই প্রীত হন, তুষ্ট হন তিনি প্রিয়। তিনি আমার একান্ত আপন, পরমধন। তিনি চিরন্তন পথ-সাথী। নিরন্তর সঙ্গদান করেন তাই তিনি চিরসঙ্গী, তিনি চিরজীবনের একান্ত আপন। প্রেমময় শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্র একটি অপূর্ব শব্দপ্রয়োগ করেছিলেন। শব্দটি– 'প্রিয়পরম'। তিনি পরমপ্রিয়। যাঁর সমান কেউ নয়। যাঁর চেয়ে বড়ও কেউ নেই– তিনি প্রিয়পরম।

বাস্তব জীবনের সুখ-দুঃখ, ভাল-মন্দ, ব্যথা-বেদনা, কান্না-হাসি, –যা কিছুর উৎস ও আশ্রয় যা কিছু– সবই তিনি। কবি তাই গাইলেন–

'তৃপ্তি আমার, অতৃপ্তি মোর মুক্তি আমার বন্ধন ডোর
দুঃখসুখের চরম আমার জীবন মরণ হে।'

প্রিয়পরমই আমার জীবনের তৃপ্তি, অতৃপ্তি, মুক্তি, বন্ধন, সুখ-দুঃখ, জীবন-মরণ– যা কিছুরই চরম ও পরম আশ্রয়। 'গতি'র উৎস 'গম্' ধাতু– গমন করা। যাওয়া, চলমানতার অবলম্বন, আশ্রয়, শরণ। 'পা' ধাতুর দুটি অর্থ– হিংসা করা, রক্ষা করা। সংকট নিরসনের মাধ্যমে যিনি আশ্রিতকে রক্ষা করেন তিনি শরণাগতের পরম প্রীতি।

রাবীন্দ্রিক আত্মনিবেদনের আকুতি–

'আমার সকল গতির মাঝে পরম গতি হে,
নিত্য প্রেমের ধামে আমার পরম পতি হে।'

আমাদের চলমানতার পরম আশ্রয় পরম গতিই পরমপিতা, তিনিই পরম-প্রেমধাম, পরমপতি। পতি শব্দের উৎস 'পা' ধাতু– রক্ষা করা। তিনিই জীবনের রক্ষক। তিনিই ভর্তা–পালক–পালনকর্তা।

সেই সত্য-সুন্দর আমারই চির একান্ত, তিনি শুধু আমার একার নন, সকলের, বিশ্বজনের হৃদয় হরণকারী 'বিশ্ব হতে চিত্ত বিহার'। কবির একান্ত অনুভব– 'অন্তবিহীন লীলা তোমার নূতন নূতন হে।'

লীলা– লী– 'আলিঙ্গনে, লা– গহেণে পরিবেশকে সহজভাবে হৃদয়ে গ্রহণ করা, দেবী প্রেম-তৎপরতা, এ লীলা অনন্ত, এ লীলা বিচিত্র, নব নূতন, চির নবীন, চির পুরাতন।

হৃদয়কে চিরদিন পরমবান্ধব বন্ধনে বেঁধে রাখেন তাই চিরবন্ধু তিনি অনাথের নাথ, সুখ শান্তির অমৃত পাথার, তিনিই আনন্দলোক, শোক-নাশক, শোক-অপহারক, তিনি চিরন্তন অসীমশরণ।

প্রেমময় শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্র বলতেন– 'মা আমার নাম দিয়েছিলেন অনুকূল, সারাজীবন ধরে আমাকে প্রতিকূলতার বিরুদ্ধেই যুদ্ধ করতে হয়েছে।'

সাহিত্য-সংস্কৃতি– যেন অনুকূল-চেতনার সহজ উত্তরাধিকার। 'অনুকূল'-জননী দেবী মনোমোহিনী একটি সহজ ছড়ায় তাঁর সন্তানের জন্মদিনের যে ঐতিহাসিক জীবন-মন্ত্র উচ্চারণ করেছিলেন সেইটিই যেন অনুকূল–প্রাণন-লিপি–

"অকূলে পড়িলে দীনহীন জনে
নুয়াইয়ো শির কহিও কথা।
কূল দিতে তারে সেধো প্রাণপণে

লক্ষ্য করি তার নাশিও ব্যথা ।"

মাতৃপ্রীতি যেন অনুকূলপ্রীতিরই এক বাস্তব প্রাণ সত্তারই জীবনায়ন ।

দেবী মনোমোহিনীর আবির্ভাবক্ষেত্র হিমাইতপুর । শ্রীঅনুকূলচন্দ্রের আবির্ভাবভূমিও তাই । তাঁর পুণ্য আবির্ভাব স্মৃতিধন্য হিমাইতপুরধামে তাঁরই স্মৃতি-বিজড়িত অবিস্মরণীয় মহাতীর্থের একাংশে ঐতিহাসিক স্মৃতিমন্দির নির্মাণের স্বপ্ন– দেশের অগণিত মানুষকে উজ্জীবিত করেছে– সাহসী প্রেরণার, বাঁচা-বাড়ার সাহস জুগিয়েছে ।

১৯৯৬ এর ২১ ফেব্রুয়ারিতে প্রকাশিত আমার কবিতাগ্রন্থ 'সমুদ্র-চায়ের পেয়ালায়'-এর একটি কবিতার কয়েকটি পংক্তি উদ্ধৃত করছি– কবিতাটির নাম–

"শিউলি সুঘ্রাণ মাখা একমুঠো ধুলি"

"তুলে নিতে দাও তুমি আমাকে অবাধে–
পিতার প্রাঙ্গণ হতে
শিউলি-সুঘ্রাণ মাখা, একমুঠো ধূলি ।
এ আমার জন্মার্জিত স্বাভাবিক উত্তরাধিকার
পৈত্রিক রক্তের থেকে পাওয়া । সে কারণে
কোনমতেই একে আমি হারাতে পারি নে ।
আমার রক্তে ও মাংসে অস্থিতে মজ্জায়
সত্তার প্রতিটি কোষে স্নায়ুর-তন্ত্রীতে
স্বপ্নে জাগরণে লীণ-প্রাণ-চেতনায়
এ ধুলির আণবিক স্বতঃবিকিরণ ।
শরতের প্রভাতের সূর্যের মতো
আমার ব্রহ্মদ পিতার প্রথম হাসিতে
এর অনুকেন্দ্রিকেরা মুক্তাগর্ভ মহার্ঘ সাগর॥"

এই স্মৃতি-ঋদ্ধ ফাল্গুনী প্রভাতে আমি রাবীন্দ্রিক পূজা পর্বে আত্মনিবেদিত হই ।–

"ও অকূলের কূল, ও অনাথের গতি,
ও অনাথের নাথ, ও পতিতের পতি ।
ও নয়নের আলো, ও রসনার মধু,
ও রতনের হার, ও পরানের বধূ ।
ও অপরূপ রূপ, ও মনোহর কথা,
ও চরমের সুখ, ও মরমের ব্যথা ।
ও ভিখারির ধন, ও অবোলার বোল–
ও জনমের দোলা, ও মরণের কোল ॥"

দোল-দীপালীর পুণ্যলগ্নে তাই ভক্তিপূর্ণ প্রণাম প্রভুকে–

"দীনহীন বিপন্নানাং প্রাণিণাং প্রাণবল্লভঃ ।
অকূলানাং সমুদ্ধারেণানুকূলোহি নমো নমঃ ॥"
–দীনহীন বিপন্ন প্রাণী জগতের
প্রাণবল্লভ, তিনি চির-উদ্ধার ।
কূলহারা জীবনের তিনি অনুকূল
নমো নমো নমো নমো বারবার॥"

বন্দেপুরুষোত্তমম্ ।

প্রণিপাতেন পরিপ্রশ্নেন সেবয়া

(শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্রের সহিত কথোপকথন)

সঙ্কলয়িতাঃ শ্রীপ্রফুল্লকুমার দাস; এম এ

(পূর্ব প্রকাশের পর)

১৬ই পৌষ, সোমবার, ১৩৫২ (ইং ৩১/১২/১৯৪৫)

বেলা প্রায় পৌনে-এগারটা। শ্রীশ্রীঠাকুর মাতৃমন্দিরের পিছন দিকে একখানি বেঞ্চে ব'সে আছেন। হরেনদা (বসু), ক্ষিতীশদা (সেনগুপ্ত), যামিনীদা (রায়চৌধুরী), আরও অনেক দাদা ও মায়েদের মধ্যে অনেকে উপস্থিত আছেন। ক্ষিতীশদা তাঁর ঢিলেমি রকম তাড়াবার জন্য প্রায়শ্চিত্ত করার প্রস্তাব করলেন। তাতে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন, করা ভাল। তবে সবচেয়ে বড় প্রায়শ্চিত্ত আমাদের করা হয় না। সেটা হ'ল, ইষ্টস্বার্থপ্রতিষ্ঠাপন্ন হ'য়ে নিয়মিত তপস্যা করা। তা' করতে গেলেই আত্ম-বিশ্লেষণ এসে পড়ে। ধরো, তোমার একটা সময়ের মধ্যে একজনের কাছে যাওয়ার কথা ছিল, কিন্তু নির্দিষ্ট সময়ে তার কাছে যেতে না পারায় তার সঙ্গে দেখা হ'ল না এবং তার কাছ থেকে চিঠি নিয়ে তোমার অন্য যে যায়গায় যাওয়ার কথা ছিল– ইষ্টকর্মের সুবিধার জন্য, তা'-ও হ'ল না। অনেকগুলি কাজই হয়তো পণ্ড হ'ল। একেবারে পণ্ড না হ'লেও দেরী প'ড়ে গেল। তখন তুমি হয়তো ভাবছ– আসতে এই দেরীটা হ'ল কেন? তুমি হয়তো দেখতে পেলে, চা খাওয়ার অভ্যাস আছে, চা খেয়ে যেতে দেরী হ'য়ে গেছে। এইটে বুঝে তুমি যদি ঐ বদভ্যাসের দাসত্ব ত্যাগ কর অর্থাৎ, সময়মত না জুটলো তো না খেলাম–এমনতরভাবে অভ্যস্ত হও, তাহ'লে সেইটে হবে প্রায়শ্চিত্ত। বাস্তবভাবে ইষ্টস্বার্থপ্রতিষ্ঠামূলক দায়িত্ব নিয়ে চলতে থাকলে তখন ধরা পড়ে– কোথায় আমাদের কোন্ প্রবৃত্তি লুকিয়ে আছে এবং তা' কতখানি বাধা দিচ্ছে। ইষ্টকাজে যা' বাধার সৃষ্টি করে তাকে কখনও বরদাস্ত করতে নেই। এইভাবে ধ'রে ধ'রে চরিত্রের গলদগুলি দূর করতে হয়। মায়া ক'রে পুষে রাখতে হয় না।

যামিনীদা– আমাদের continuity (ক্রমাগতি) থাকে না।

শ্রীশ্রীঠাকুর– সেও complex (প্রবৃত্তি)-এর obsession (অভিভূতির)-র দরুন। সেই দিকে আকর্ষণ বেশী থাকায় পারি না। তাই বাধা জন্মায়। ওকে ignore (উপেক্ষা) ক'রে জোর ক'রে করা লাগে। যেটা করা যায় সেইভাবের অভ্যাসই পাকা হয়।

হরেনদা– যে কাজই করতে যাওয়া যাক, অর্থবল খুবই প্রয়োজন।

শ্রীশ্রীঠাকুর– চরিত্রে সেবাসম্বর্দ্ধনা থাকলে অর্থ আপনি আসে। আর তা' না থেকে অর্থ থাকলে, সে অর্থ টেকে না এবং কাজেরও যে খুব একটা ফয়দা হয়, তা'ও না।

এরপর শ্রীশ্রীঠাকুরের স্নানের সময় হওয়ায় সবাই বিদায় নিলেন।

১৭ই পৌষ, মঙ্গলবার, ১৩৫২ (ইং ১/১/১৯৪৬)

বেলা যায় যায়। শ্রীশ্রীঠাকুর আশ্রম-প্রাঙ্গণে মাতৃমন্দিরের পিছনে ব'সে আছেন। শচীনদা (গাঙ্গুলী), সুশীলদা (বসু), গৌরদা (ঘোষ), যামিনীদা (রায়চৌধুরী) প্রভৃতি দাদারা ও মায়েদের মধ্যে অনেকে উপস্থিত আছেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর কথাপ্রসঙ্গে মদনদাকে (দাস) বললেন– মানুষ চাওয়ার পাগল, করায় নয়। মানুষ বলে, সে সুখী হ'তে চায়, বড় হ'তে চায়, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তা' চায় না। কারণ, করার কথা বললে মুখ মলিন হ'য়ে যায়। যদি সত্যিই চাইত, তবে করতে নারাজ হ'ত না। আর, ক'রে যারা পেতে চায় না, তাদের দিলেও তারা কিছু পায় না। পাওয়াটা ধ'রে রাখতেও অনেকখানি করতে লাগে। দয়ার দানে যারা পায়, তাদের অনুযোগ যায় না। ভাবে, তাদের যা' পাওয়া উচিত তা' তারা পাচ্ছে না। যোগ্যতার ভিতর-দিয়ে যারা পায় তারা ভাবে– করলাম কতটুকু, পেলাম কতখানি, পরমপিতার কী অপার দয়া! তাদের সুখ ধরে না। তাই বলি, কর। করার অভ্যাস যাদের আছে, করা যাদের ভাল লাগে তারা না চাইলেও পায়।

এরপর শ্রীশ্রীঠাকুর ওখান থেকে উঠে পড়লেন।

২০ পৌষ, শুক্রবার, ১৩৫২ (ইং ৪/১/১৯৪৬)

সন্ধ্যা ৬টা। শ্রীশ্রীঠাকুর মাতৃমন্দিরের বারান্দায় দক্ষিণাস্য হ'য়ে বসেছেন। আলো জ্বালিয়ে দেওয়া হয়েছে। কেষ্টদা (ভট্টাচার্য্য), রত্নেশ্বরদা (দাশশর্ম্মা), সুরেনদা (বিশ্বাস), শৈলেনদা (ভট্টাচার্য্য), মহিমদা (দে) প্রভৃতি ভক্তবৃন্দ শ্রীশ্রীঠাকুরকে ঘিরে ব'সে আছেন। নানা বিষয়ের আনন্দ-মধুর আলাপ-আলোচনা চলছে। এমন সময় সতুদা (সান্যাল) কলকাতা থেকে এসে শ্রীশ্রীঠাকুরকে একটা গিনি দিয়ে প্রণাম কররেন। সাধারণতঃ যে যা দিয়েই প্রণাম করুক,

শ্রীশ্রীঠাকুর তা' স্পর্শও করেন না । অন্য কেউ তুলে রেখে দেয় । ফ্যাতনদা এক হাঁড়ি মিষ্টি এনে দিলেন । শ্রীশ্রীঠাকুর তা' শ্রীশ্রীবড়মার কাছে দিতে বললেন এবং গিনি হাতে নিয়ে বলতে লাগলেন– এ আমি কোথায় রাখি?

পরে সতুদাকে বড়মাকে ডাকতে বললেন । বড়মা আসার পর বললেন–সতু আমার জন্য এই গিনিটা এনেছে । এটা রেখে দেও, খরচ ক'রো না । এ গিনি আমার অযুতকোটি টাকার সমান, টাকা বললে ছোট হ'য়ে যায়, অযুতকোটি অর্থের সমান । এ হ'ল মহানিধি । ও যে দিতে শিখেছে এই বুদ্ধি যদি বজায় থাকে, এই-ই ওর সৌভাগ্যের সূচনা ।

পরে আবার ফ্যাতনদাকে জিজ্ঞেস করলেন– শুধু আমার জন্য এনেছে, না, ওর মার জন্যও এনেছে ।

ফ্যাতনদা– একটাই তো এনেছেন ।

শ্রীশ্রীঠাকুর– ওর মাকেও দেবে ।

পরে সতুদা এসে বললেন– আমাকে দিলি, তোর মাকে একটা দিলি না?

সতুদা– তা' দিলেই হ'ল ।

শ্রীশ্রীঠাকুর– হ্যাঁ, এবার দেওয়া ফুটে উঠুক । দিতে পারাটা বড় সুখের ।

সতুদা আনন্দ-বিহবল দৃষ্টিতে শ্রীশ্রীঠাকুরের দিব্যোজ্জ্বল মুখের দিকে চেয়ে রইলেন । বোধহয় ভাবছেন, তার জন্য যাঁর করা ও দেওয়ার সীমা-পরিসীমা নেই, তিনি সামান্য একটু প্রীতি-অভিজ্ঞান পেয়ে যে এতখানি খুশী হয়েছেন তা' শুধু তারই কল্যাণের সম্ভাব্যতাকে লক্ষ্য ক'রেই । সত্যি, শ্রীশ্রীঠাকুরের সেদিনকার অভিব্যক্তি ভোলবার নয় ।

এরপর সতীত্ব-সম্বন্ধে কথা উঠলো । একজন বললেন, chastity (সতীত্ব) অনেকেরই ঠিক আছে ।

শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন–তাকিয়ে দেখ, তার মধ্যে অনেকের chastity (সতীত্ব) হয়তো chidden chastity (ভর্ৎসনাধুক্ষিত সতীত্ব) । অর্থাৎ, তা' সহজ ও স্বতঃ নয় । লোকভয়ে হয়তো কায়িক সতীত্ব বজায় রাখে কিন্তু কায়মনোবাক্যে স্বামিনিষ্ঠ হ'য়ে চলা যাকে বলে তা' নয় । সেই নিষ্ঠা থাকলে স্বামীকে মনে করে নিজের সত্তা । নিজের সত্তার উপরে যে টানটা থাকে মানুষের, তাই বর্ত্তায় গিয়ে স্বামীর উপর । সে স্বামীকে সুখী না ক'রে ছাড়ে না, বড় না ক'রে ছাড়ে না । মরা স্বামীর হাড়ে সে প্রাণ সঞ্চার ক'রে ছেড়ে দেয় । যেমন দিয়েছেন সতী বেহুলা । তাই, সতীত্ব একটা সাধনার বস্তু । জন্মগত প্রকৃতি সাত্ত্বিক না হ'লে অমনতর সতী হ'তে পারে না । অমন সতী মেয়ের বাপ-মা হ'তে গেলেও অনেক পুণ্য থাকা লাগে । সতী মেয়েরা কুল পবিত্র ক'রে তোলে । যেখানে যায়, সেখানেই সোনা ফলায় । লক্ষ্মী, সরস্বতী দুই-ই তাদের পাছে-পাছে ঘোরে । তাদের পেটের ছেলেপেলেরা হয় এক-একটা দেবতা । ..... সাধারণতঃ ছেলেবেলা থেকে বাপের উপর যে-মেয়েদের নেশা থাকে, তাদের পরে ভাল হ'তে দেখা যায়, স্বামীনিষ্ঠ হ'তে দেখা যায় ।

কেষ্টদা– সতীত্বের সঙ্গে ইষ্টনিষ্ঠার কোন সম্পর্ক নেই?

শ্রীশ্রীঠাকুর–হ্যাঁ, তা' আছেই । স্বামীর সত্তাসম্বর্দ্ধনার খাতিরেই সে নিজে ইষ্টমুখী হয় এবং নিজের সেবাযত্ন ও মিষ্ট ব্যবহারে স্বামীকেও ইষ্টে আপ্রাণ ক'রে তোলে । কারণ, সে জানে, ইষ্টীচলনের ভিতরেই স্বামীর মঙ্গল নিহিত । সে স্বামীকে নিজের ভোগসুখের উপকরণ ক'রে সঙ্কীর্ণ জীবনে আটকে না রেখে বিস্তারের পথে– বৃদ্ধির পথে ঠেলে দেয় । আবার, ইষ্টায়িত অনুচলনের ভিতর-দিয়ে স্বামীনিষ্ঠা বেড়েই যায়, কারণ তাতে নিজের প্রবৃত্তিগুলিও অনেক নিয়ন্ত্রিত হ'য়ে ওঠে । ..... আমাকে আপনারা যেমন ক'রে পাচ্ছেন বরাবর, বড়বৌ যদি বাধা দিত, তাহ'লে আমাকে এমন ক'রে পাওয়া আপনাদের মুশকিল ছিল ।

এ দিনের আলাপ-আলোচনা এখানেই শেষ হ'ল ।

২১শে পৌষ, শনিবার, ১৩৫২ (ইং ৫/১/১৯৪৬)

শ্রীশ্রীঠাকুর প্রাতে মাতৃমন্দিরের বারান্দায় কেষ্টদা (ভট্টাচার্য), শরৎদা (হালদার), ভোলানাথদা (সরকার), প্রমথদা (দে) প্রভৃতির সঙ্গে বর্ত্তমান অবস্থায় কাজকর্ম কী-ভাবে করতে হবে, সেই সম্বন্ধে নিভৃতে আলোচনা করছেন ।

ইলেক্সন সম্পর্কে বললেন– ইলেক্সনে আপনারা তাদেরই support (সমর্থন) করবেন, যারা নিজেরা ভাল মানুষ এবং সৎ-এর সম্বর্দ্ধনায় সক্রিয় । তারা শুধু সৎ-এর পোষণ করবে না– মন্দকেও নিরোধ করবে । এমনতর যারা, তাদের আপনারা support (সমর্থন) করবেন । –সৎসঙ্গী candidate (প্রার্থী) যারা, তাদেরও দেখবেন । সব কাজের মধ্যে মনে রাখবেন, ভাল-ভাল লোক দীক্ষিত ক'রে তোলাই আপনাদের প্রধান কাজ । এই বাজারের মধ্য-দিয়ে আমার desired men (ঈপ্সিত লোক) জোগাড় করুন । অন্ততঃ ৫/৭ জন pilot men (চালক লোক) দরকার, যারা বুঝে-সুঝে অমোঘ উদ্দীপনায় তরতরে হ'য়ে রয়েছে– অটুট নিষ্ঠা নিয়ে আত্ম-নিয়ন্ত্রণী উৎসাহ নন্দিত হ'য়ে; যাদের বলতে পারেন apostles (ধর্ম্মদূত) । তারা হবে Brahminical temperament (ব্রাহ্মণ্য)-ওয়ালা– sincere (একনিষ্ঠ), pushing (অগ্রগামী), zealously adventurous (উৎসাহী সৎসাহস-সম্পন্ন); এরা science (বিজ্ঞান)-এর

এম-এ, অর্থাৎ এম্ এস-সি হ'লে ভাল হয়। দরকার হ'লে এরা আমেরিকা যাবে, বিলাত যাবে, জার্ম্মানী যাবে, দুনিয়ায় ছড়িয়ে দেবে আপনাদের কথা। এছাড়া ৩০০ wholetime (পূর্ণকালিক) ঋত্বিক্ দরকার। সন্ন্যাসী ধাঁজের মানুষ হয়, bacheler (অবিবাহিত) হয়, তাহ'লেই ভাল হয়। এরা অন্ততঃ graduate (বি-এ বা বি-এস-সি পাশ) হওয়া দরকার। Right man in the right place (উপযুক্ত স্থানে উপযুক্ত লোক) যদি হয়, তাহ'লে দেখবেন, কী হ'য়ে যায়। প্রত্যেককে বক্তৃতা দেওয়া ভাল ক'রে শিখিয়ে নেবেন। এমন ক'রে বলবে যে নিথর যে, তার অন্তরও আপনাদের ভাবে অনুরণিত ক'রে তুলবে, কাঁপিয়ে তুলবে।

কেষ্টদা– ভাল বলতে জানলেই যে সবসময় তারা মানুষকে ভালভাবে influence (প্রভাবিত) করতে পারে, তা' কিন্তু নয়।

শ্রীশ্রীঠাকুর– যা' বলে তা' যদি আচরণ করে, বলায়-করায় সামঞ্জস্য যদি থাকে, তাহ'লে সে বলার প্রভাব হয় অন্যরকম। Conviction (প্রত্যয়) ও conduct (আচরণ) যার যত পাকা, তার বলার ততখানি প্রভাব হয়। এই নিয়ে মাতাল হওয়া চাই, নিরন্তর লেগে থাকা চাই, যার অমনতর নেশা ধরে, সে অন্যকেও মাতাল ক'রে তোলে। জাগ্রত সন্ধিৎসা নিয়ে চলে ব'লে সে প্রতিমুহূর্তে আদর্শকে নুতন ক'রে বোধ করে, তা'র মধ্যে নুতন সঙ্গতি পায়। এই অনুভবের কথা যখন বলে, তখন মানুষের প্রাণ আকূল হ'য়ে ওঠে।

এরপর বললেন– আমাদের কলেজ, বোর্ডিং ইত্যাদির জন্য আপাততঃ এক লাখ টাকা সংগ্রহ করতে হবে। এটা ডিপোজিটের ২৫,০০০ টাকা বাদ দিয়ে। তা'ছাড়া কলেজ চালাবার জন্য প্রতিমাসে ৫,০০০ টাকা আলাদা জোগাড় করতে হবে। যে লিমিটেড কোম্পানী করবেন ব'লে ঠিক করেছেন, আমার মনে হয়, প্রেস ও পেপারের জন্য আলাদা কোম্পানী করলে ভাল হয়। দুই জোড়া কাগজ কলকাতা থেকে বের করুন। নিজেদের দাঁড়ায় চুটিয়ে লিখুন।

শুধু কলকাতা থেকে নয়, পাটনা, দিল্লী, বম্বে, মাদ্রাজ, এলাহাবাদ বা লক্ষ্ণৌ থেকেও কাগজ বের করতে হয়্ সুপ্রতিষ্ঠিত অন্যান্য কাগজগুলির সঙ্গেও যোগাযোগ স্থাপন করতে হয়।

এসব কাজের জন্য উপযুক্ত কর্ম্মী চাই। Selected pick (সুনির্চাচিত লোক) না হলে অনেক সন্ন্যাসীতে গাজন নষ্ট। জণসাধারণের সঙ্গে যোগসূত্র রচনার জন্য, তাদের সেবার জন্য দীক্ষিত ও অদীক্ষিত সবরকম লোক নিয়ে আপনারা একটা স্বতন্ত্র প্রতিষ্ঠান ইচ্ছা করলে করতে পারেন। তার নাম দেওয়া চলে T.T.C. (Tenant Tending Concern –প্রজাসংরক্ষণী সমবায়)। যাই করতে চান, লোক দরকার। Sincere, tactful (একনিষ্ঠ, সুকৌশলী) লোকেরই অভাব।

আর একটা কথা– কাজের জন্য কলকাতায় নিজের বাড়ী ও গাড়ীও কিন্তু প্রয়োজন। এ করা কিন্তু শক্ত কিছু নয়। লাগলে এক ঠেলায় হয়ে যায়।

আহ্বান

ইষ্টপ্রাণেষু দাদা/ মা

রা-নন্দিত জয়গুরু। প্রেমময় শ্রীশ্রীঠাকুরের অবারিত করুণায় পরমতীর্থধামে প্রতিদিনই বহু তীর্থযাত্রীর শুভাগমন ঘটে। এছাড়া আশ্রমে নিয়মিত ভক্তবৃন্দ এবং অবস্থানরত ছাত্রগণের দৈনন্দিন আনন্দবাজারের ব্যয় সংকুলানের ব্যাপারটি বেশ কঠিন হয়ে উঠেছে, সেক্ষেত্রে সারাদেশে অবস্থিত ইষ্টপ্রাণ সুযোগ্য ভক্তবৃন্দের অনেকেই ব্যক্তিগতভাবে কিছু দায়িত্বগ্রহণ করতে পারেন। বছরের প্রতিদিনই অর্থাৎ ৩৬৫ দিনই জনপ্রতি ১দিন কেন্দ্রীয় আশ্রমে আনন্দবাজারের প্রসাদের জন্য প্রয়োজনীয় অর্থসংযোগ করলে আশ্রমের অর্থনৈতিক সাশ্রয় ঘটবে এবং দায়িত্ব গ্রহণকারীর প্রতিও পরমপিতার কল্যাণ অবারিত বর্ষিত হবে।

তাঁর এই করুণাধারায় মিলিত হবার জন্য সবার কাছে উদাত্ত আহ্বান জানাচ্ছি।

বিনয়াবনত–

সভাপতি
শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্র সৎসঙ্গ

সাধারণ সম্পাদক
শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্র সৎসঙ্গ

দিব্যবাণী
(বিধি-বিন্যাস)
–শ্রীশ্রীঠাকুর

তুমি কী চাও?
সে-চাহিদা কি সুক্রিয় তৎপরতায়
সম্বেগশালী হ'য়ে
তোমার জীবনে ফুটন্ত হ'য়ে উঠেছে?
তুমি কি তোমাকে সুকেন্দ্রিক ব'লে
সক্রিয়ভাবে আত্মপ্রসাদ
অনুভব ক'রে থাক?
তুমি শ্রেয়কেন্দ্রিক ব'লে
স্মিত-তর্পণায়
অন্তরে কি পরিতৃপ্ত আছ?
যদি থেকে থাক,—
তোমার শ্রেয় যিনি,
আদর্শ বা ইষ্ট যিনি,
তাঁ'র অনুজ্ঞা বা চাহিদাগুলিকে
ত্বরিত উপচয়ী তৎপরতায়
কেমন ক'রে কতখানি
নিষ্পন্ন ক'রতে পেরেছ
বা পেরে থাক?
আর, তা' সর্ব্বাঙ্গ-সঙ্গতিসম্পন্ন
সার্থকতায় উদ্ভিন্ন হ'য়ে
সর্ব্বগত সার্থক বিনায়নে
শুভ-সন্দীপ্ত হ'য়ে উঠেছে কি না?
যদি তা' হ'য়ে থাকে,
তোমার চাহিদা-আপূরণের প্রদীপ্তি
তোমাতে অনেকখানি
প্রতিষ্ঠা লাভ ক'রেছে,
ফল কথা, তোমার সুকেন্দ্রিক তৎপরতা
যত আবিল,
অর্থাৎ আত্মস্বার্থ-সংক্ষুধ
প্রবৃত্তি-চাহিদা-উদ্‌যাপনের ভিতর-দিয়ে
ঐ শ্রেয়-অনুজ্ঞাকে
যতই সুফল ক'রে তুলতে চা'চ্ছ,—
ততই কিন্তু তা'
সুসম্পন্ন না হওয়ার দিকেই
নেতিয়ে প'ড়তে থাকবে,
যা'র ফলে, তোমার প্রত্যাশাও
আপূরিত হবে না,
ঐ আদর্শ-অনুজ্ঞাকেও
নিষ্পন্ন ক'রতে পারবে না,
একটা বিচ্ছিন্ন বিকৃতির
আচ্ছন্নতা নিয়ে
জীবনকে পরিচালিত ক'রতে হবে তোমার;
তাহ'লে
তুমি যা' চাও,
তা' লাভ করবার
গোড়ার ব্যাপারই হ'চ্ছে—
ঐ সুকেন্দ্রিক সুক্রিয় কর্ম্মতৎপরতা,
যা' সব দিক্ বিবেচনা ক'রে
সার্থক সঙ্গতি নিয়ে
না-হওয়ার কারণগুলিকে
এড়িয়ে বা নিরোধ ক'রে
সুনিষ্পন্নতায়
হওয়াকে আবাহন ক'রে থাকে;
ঐ শ্রেয়-অনুজ্ঞা
তড়িৎ-দীপনায়
যতই অমনতরভাবে
নিষ্পন্ন ক'রতে পারবে,
আর, তোমার চাহিদা
যতই তাঁতে একান্ত হ'য়ে উঠবে,
আপূরণী তৎপরতায়
তোমার চাওয়াটা
পাওয়াতেও সুগম হ'য়ে উঠবে তেমনি;
এই হ'চ্ছে—
চাহিদাকে সুঠাম নিষ্পন্নতায় পেয়ে
বোধি ও ব্যক্তিত্বের অনুশ্রয়ী সঙ্গমে
অনুশীলনে
যোগ্যতায় সুদীপ্ত হ'য়ে ওঠার পথ;
যদি চাও,
এমনতরই ক'রে চল,
তাঁতেই বিভোর হ'য়ে থাক,
পাওয়া তোমাতে বিভোর হ'য়ে
শ্রদ্ধাঞ্জলিতে
ঐশ্বর্য্যের উদগমে
উদ্ভাসিত হ'য়ে উঠবে। ৮২।
পোষ্য যদি
পালকের উপচয়ী হ'য়ে না ওঠে—
শরীরে, মনে, বাক্যে,
সক্রিয় সেবা-সৌকর্য্যে

তাঁ'কে জীবন-স্বার্থ না ভেবে
বা না ক'রে, —
তা'তে সে তো প্রবঞ্চনার প্ররোচনায়
নিজেকে বঞ্চিত ক'রে চ'লবেই,
পালকও তার
অধঃপাতের ক্রমিক সোপান
পার হ'তে-হ'তে
পরিস্থিতিরি ক্রূর সংঘাতে
নিঃশেষের দিকেই চ'লতে থাকে—
অনেক ক্ষেত্রে—
বিধ্বস্তির বিকৃত অনুচলনে । ৮৩ ।

তোমার জীবন-সম্বেগ
যেমন চাহিদা-অনুক্রমণায়
তৎ-নিয়মনী তাৎপর্য্যে
অনুশীলন-প্রদীপ্ত হ'য়ে চ'লবে—
একাগ্র অনুপ্রাণনায়
নিরন্তর হ'য়ে,—
তোমার বৈধানিক উপাদান-বিন্যাসও
সেই ধাঁজে নিয়ন্ত্রিত হ'য়ে
তেমনতরই হ'য়ে চ'লবে—
তোমাকে যোগ্যতায় উপযুক্ত ক'রে,
প্রাপ্তিও ঘটবে তেমনি,
এই হওয়ার চলাই আত্মিক-অভিগমন ;
ঈশ্বর এক,
একাগ্র নিরন্তর অনুশীলনার ভিতর-দিয়েই
রূপায়িত হ'য়ে থাকেন তিনি । ৮৪ ।

তোমার অন্তর্নিহিত উচ্ছল আবেগ
যে-চাহিদায় অন্তরাসী হ'য়ে
অভিনিবেশ-সহকারে
তৎপ্রাপ্তির অনুবেদনায়
যেমন ক'রে তা' হয়—
তদনুগ নিয়মনায়
সুসঙ্গত পরিবেদনায়
তোমার করণ ও চলনাকে নিয়ন্ত্রিত ক'রে
যেমনতর নিষ্পন্নতায়
আরূঢ় হ'য়ে উঠবে—
তদনুপাতিক আত্মনিয়মনে,—
হবেও তা'ই ;
এই হ'চ্ছে—
বিধি-বিনায়নী তৎপরতায়
হ'য়ে পাওয়া,
ঐ পাওয়ার বিধিকে উল্লঙ্ঘন ক'রে
তোমার চাহিদা
যতই উদগ্র হ'য়ে উঠুক না কেন,
ঐ হওয়াও হ'য়ে উঠবে না,
পাওয়াও জুটে উঠবে না,
কথায় বলে—
'যা' চায়, তা'ই পায়,
বিধি কা'রউ বাম নয়' ;
ঈশ্বর আত্মিক-সম্বেগ,
চাহিদার আকূতি-দীপনা,
হওয়ার আত্ম-বিনায়নী সংশ্রয়,
পাওয়ার মূর্ত্ত বিগ্রহ । ৮৫ ।

যা'র স্বার্থে তুমি স্বার্থান্বিত—
শ্রেয়কেন্দ্রিক হ'য়ে,
যা'র অন্তরাস
তোমাকে অন্তরাসী ক'রে তুলেছে,
যা'র সুখ তোমাকে উৎফুল্ল ক'রে তোলে,
যা'র দুঃখে তুমি উৎকণ্ঠ হ'য়ে ওঠ,
অভাবে অবসন্ন হও,
যা'র সম্বর্দ্ধনী, উপচয়ী প্রচেষ্টা
ক্লেশকর হ'লেও সুখপদ এবং প্রীতিপদ তোমার
তুমি স্বতঃই তা'তে সক্রিয় হ'য়ে ওঠ,
যা'র প্রাপ্তি তোমাকে পূর্ণ ক'রে তোলে,
এক কথায়,
যা'র সত্তাই তোমার সত্তার সম্পদ্,
স্বভাবসিদ্ধ—
সে তোমার আপ্ত,
এমন-কি, তা'র ভর্ৎসনা বা পীড়নেও
না থাকে তোমার অভিমান,
না থাকে অহঙ্কার,
না থাকে অপমান,
আর, তা'র অভ্যুদয়ী প্রচেষ্টা
ঘৃণা, লজ্জা, ভয়কে
অতিক্রম ক'রে চ'লে থাকে—
উপচয়ে সম্বর্দ্ধিত ক'রতে
এ আপ্ত যে তা'কে, —
স্বার্থক্ষুধাকে অবজ্ঞা ক'রে—
প্ররোচিত না হ'য়ে তা'তে,
আত্মত্যাগে উপচয়ী ক'রে তুলতে
তা'কে,
তাই, তা'র অর্থ ও সম্পদ্
প্রাকৃতিকভাবেই
তোমাতে অর্থান্বিত হ'য়ে ওঠে—
সহজ পারস্পরিকতায়,
কারণ, সে তোমার আপনার
সে তোমার আত্মীয় । ৮৬ ।

মাতৃদীপনা

(মায়েদের জন্য বিশেষ সাহিত্য আসর)

সেবা বিধায়না

–শ্রীশ্রীঠাকুর

যে-ব্যাপারেই যাও না কেন,
যে-বিষয়েই উপস্থিত থাক না কেন,–
শুধুমাত্র অলস দর্শক হ'য়ে
কাষ্ঠপুত্তলিকাবৎ থেকো না,
শুভ-ইচ্ছা-অনুপ্রাণিত হ'য়ে
তোমার পক্ষে যেখানে যা' সম্ভব
ক্ষিপ্রতার সহিত
বিহিতভাবে নিষ্পন্ন ক'রো,
সাহায্য ক'রো,–
এতে তোমার উপস্থিত বুদ্ধি
বেড়ে যাবে,
স্নায়ুগুলিও সক্রিয় হ'য়ে উঠবে,
শরীরও তা'তে তৎপর থাকবে;
অলস দর্শকের বোধিও
বিবশ হ'য়েই থাকে,
ধারণায়ও
তা'র কোন বাস্তব অনুবেদনা থাকে না,
ক্লীব ব্যক্তিত্বের সঙ্গে
ক্লীব ধীই
ক্লৈব্য-অনুগতি নিয়ে
চলাফেরা করে সেখানে,
বিভুতি-বিভবের
অধিকারী হয় সে কমই । ১৫৩ ।

তোমার ঈশ্বর-আনতি-অনুরঞ্জিত অনুচর্য্যা
ভজন-দীপনায়
লোক-সেবা-নিরতি নিয়ে
তা'দের বর্দ্ধনাকে উচ্ছল ক'রে তুলবে যতই–
যোগ্য অনুশীলনের ভিতর-দিয়ে
হৃদ্য আপ্যায়নায়
তা'দিগকে শুভ-প্রসাদ-মণ্ডিত ক'রে,–
তোমার ভিক্ষাও ততই
সিদ্ধ হ'য়ে উঠবে,
আর, তা' সার্থকতা লাভ ক'রবে–
ঐ ঈশ্বর-অনুবেদনী অনুচর্য্যায়,
তোমার সত্তার পালনপোষণী পরিচর্য্যাকে
স্বতঃ ক'রে তুলে,
অভাব
বিভবে উদ্ভিন্ন হ'য়ে
তোমার স্বভাবকে স্মিত ক'রে তুলবে–
সহ্য, ধৈর্য্য, অধ্যবসায়ী প্রভাব বিস্তার ক'রে;
না ক'রে
ভাঁড়িয়ে যে বিভব-তৃষ্ণা
তা' জীবনকে প্রভাবান্বিত ক'রে তোলে–
প্রতিক্রিয়ায়
বিষাক্ত অবদান প্রসব ক'রে । ১৫৪ ।

পূরয়মাণ যে-কোন ধর্ম্মসংস্থা
বা দ্বিজাধিকরণই হো'ক না কেন,
সুসঙ্গ ইষ্টার্থী সার্থক-অন্বয়ে
বিহিত বৈশিষ্ট্যপালী অনুচর্য্যা নিয়ে
তা'র গণ বা প্রতিষ্ঠানের আশ্রয় হওয়া,
তা'দিগকে রক্ষা করা,
সাহায্য ও সম্বর্দ্ধনা করা,
বা শ্রদ্ধানতি-সহ
তা'র তাৎপর্য্য পরিবেষণ করা মানেই–
তোমার নিজের ধর্ম্ম-সংস্থা
বা দ্বিজাধিকরণের সেবা করা;
মনে রেখো,
ঐ সংস্থা, দ্বিজাধিকরণ, গণ ও প্রতিষ্ঠানের
প্রত্যেক যা'-কিছু
অন্যেরও যেমনি
তোমারও তেমনি–ভাগবত তাৎপর্য্যে,–
যতক্ষণ না তা' ঈশ্বরদ্রোহী
অসৎ-সন্দীপী হ'য়ে ওঠে,
আর, হ'লেও তা'–
তুমি তা'র শোধন-সংস্কারে
প্রতিনিবৃত্ত হ'য়ো না । ১৫৫ ।

তুমি স্কুল কর, কলেজ কর,
দাতব্য চিকিৎসালয় কর,

আর সঙ্কটত্রাণ অভিযানই কর,
আগম, নিগম, তন্ত্রপ্রচার যতই কর না কেন,–
নিজে যদি
বৈশিষ্ট্যপালী আপূরয়মাণ ইষ্টে
আনতি ও আনুগত্যসম্পন্ন না হও,
আর, বাক্য-ব্যবহার-চাল-চলনের ভিতর-দিয়ে
তঁৎ স্বার্থ ও সঙ্গতিশীল না হও,
এবং তোমার স্বভাব ও চরিত্রের ভিতর-দিয়ে
প্রত্যেকটি অন্তরে
ঐ ইষ্টপ্রতিষ্ঠা না হয়,
তবে জেনো,
এগুলির মূল নগণ্য,
তা' সংহতি ও সম্বর্দ্ধনার কিছু নয়কো,
আশু ক্ষণিক প্রশমক হ'তে পারে–
কিন্তু আরোগ্যের ধারে-কাছেও নয়কো,
ধর্ম্মদ যোগ্যতার উদ্ভব তা'র ভিতর-দিয়ে
কিছুতেই হ'তে পারবে না–
সুসঙ্গত বোধি-তাৎপর্য্যে
পারস্পরিক অনুচর্য্যাপরায়ণ সঙ্গতি নিয়ে । ১৫৬ ।

বিহিত কেউ সেবাই করুক,
সাহায্যই করুক
আর, যে-কোন শুভ-কর্ম-নিরতি নিয়েই
চলুক না কেন–
সুসঙ্গত সাত্বত চর্য্যায়,–
পার তো তা'কে সাহায্য ক'রো,
কিন্তু তা'তে বিরতি এনো না,
অর্থাৎ, যা'তে সে তা' না ক'রতে পারে–
এমনতর কিছু ক'রো না;
যদি কর–
পাতিত্যকে আলিঙ্গন ক'রবে,
কাউকে শুভ চলন-তৎপরতা হ'তে
বিরত করা মানেই হ'চ্ছে–
জীবনীয় চলনাকে নিরস্ত করা;
অমনতর নিরস্ত করাই হ'চ্ছে–
পাপের,
পতিত্যের,
তা'তে তোমারও লোকসান,
অন্যেরও লোকসান । ১৫৭ ।

তুমি পেলে,
কিন্তু তোমার বোধ-বিনায়িত
কুশল প্রচেষ্টা যদি
অন্যের অভাব-পূরণে কাতর হয়
বা অবহেলা করে–
কিংবা অন্যকে অমনি ক'রে দিতে
অনুপ্রাণিত না করে–
আত্মপ্রণোদনী তৎপরতায়,
তোমার প্রাপ্তি
প্রতিষ্ঠালাভ ক'রবে না কিছুতেই;
আবার, তুমি যাঁ'র অনুকম্পায় পাও–
তাঁ'কে বাস্তবভাবে পূরণ না ক'রে
অভাবগ্রস্ত যা'কে যেখানে পাও,
তা'দের জন্য নিজে সাধ্যমত দায়িত্ব না নিয়ে
যদি তোমার ঐ প্রতিপালকের স্কন্ধেই
চাপিয়ে দাও,
তবে তোমার ঐ মেকী সহানুভূতি
তোমার ঐ পরিপোষককেই
বিপর্য্যস্ত ক'রে তুলবে–
তোমার পোষণ-উৎস খিন্ন হ'য়ে,
তুমিও বিপন্ন হ'য়ে উঠবে–
যোগ্যতার অপলাপী-অনুক্রমণায় । ১৫৮ ।

তুমি হাজার ঐশ্বর্য্যে
ঐশ্বর্য্যবান হও,
তা'তে যদি দুনিয়ার কেউ
খুশি না হয়,
শ্রদ্ধা-প্রীতি-ধন্যবাদে
প্রসাদ-দীপ্ত হ'য়ে না ওঠে,
তুমি ঐ ঐশ্বর্য্যে
খুশী হ'য়ে উঠতে পারবে না,
তৃপ্তিও হ'য়ে উঠতে পারবে না;
তবেই বুঝে দেখ–
তোমার সমৃদ্ধি যদি কাউকে
সমৃদ্ধ ক'রে তোলে,
তা'র সত্তায় সার্থক হ'য়ে ওঠে,
এ সমৃদ্ধি সার্থক হ'য়ে উঠবে তখনই,
প্রসাদ-মণ্ডিত হ'য়ে উঠবে তখনই,
ঐ স্বতঃস্বেচ্ছ অনুবেদনী অবদান
তোমাকে কৃতার্থ ক'রে তুলবে তখনই,
নয়তো, হ'য়েও হবে না,
পেয়েও পাবে না;
তোমার অর্থ পরার্থে সার্থক হ'য়ে
পরমার্থ লাভ ক'রবে অমনি ক'রেই । ১৫৯ ।

ছন্দে ছড়ায় জীবন আলো

(অনুশ্রুতি ৩য় খণ্ড)

–শ্রীশ্রীঠাকুর

ধাপ্পাবাজির খেলা নিয়ে
মশগুল তবু চোরের মত,
দিস্‌নে কিছু, পাস্ যে কত!
হ'চ্ছ নিজে বজ্রাহত। ১১।

হাজার পেয়েও
পাস্‌নি বলিস্
চোখটি কি তোর অন্ধ?
পাবি কী তুই
পাওয়ায় যে ছাই,
হ'লি যে কবন্ধ। ১২।

অকৃতজ্ঞ যেই হ'লি তুই
বিশ্বস্তিকে করলি শেষ,
উন্নতিরও দফা-রফা,
বেতাল চালায় হ'লি নিকেশ। ১৩।

হীন মন তোর কিসে?–
যা'দের দিয়ে উপকার পেলি
অল্প-বিস্তর যাই না হোক,
কাজটি তোমার যেই ফুরালো
কৃতঘ্নতার ধ'রলো ঝোঁক,–
এই তো তা'রই দিশে। ১৪।

আসল কথা যা'রই তুমি
সত্যি সহজভাবে,
তা'রই স্বার্থে সেই চাহিদায়
জীবনকে চালাবে;
ব্যতিক্রমটি এরই যতই
দেখবে পদক্ষেপে,
ততটা তা'য় নও তখনো
বুঝবে অনুভবে। ১৫।

সন্ততিতে মমত্ব যা'র
ইষ্টানুগ-পন্থারোধী–
নিরয় তাহার হাতের গোড়ায়
হানায় হত করে বোধি। ১৬।

পূজার ঘুষে ইষ্ট পূজে–
ইষ্ট কোথায় তা'র?
স্বার্থই ইষ্ট, তা'রই লাগি'
ঐ ভানই দরকার। ১৭।

ইষ্টসেবার বাহানা নিয়ে
টাকার দাবী যেই করে,
সন্দেহ তুই রাখিস্ সেথায়
কখন কেমন রূপ ধরে। ১৮।

প্রেষ্ঠ ব'লে ব'লছ যাঁ'রে
ধাপ্পাবাজি তাঁ'র সাথে–
আপদ-বিপদ কুটিল-কুতাব
কুড়িয়ে নেহাৎ নিচ্ছ যাকে। ১৯।

কুটিল চোখে ইষ্টে দেখে
চ'লে ফিরে কুটিল পায়ে–
সর্ব্বনাশে ফাঁপ দিবি ক্যান্
ঠেকবি কেন জীবন দায়ে? ২০।

ভন্ড নিষ্ঠা বাচক ভক্তি
শক্তি কোথায় তা'র?
নিজেকে নিয়ে মত্ত সে যে
সবেই অহঙ্কার। ২১।

নিষ্ঠাতে তোর থাকলে গলদ
এৎফাঁকে থাকে খামখেয়াল,
ইষ্ট দিয়ে কী হবে তোর
চলনই যে তোর ব্যর্থ ভয়াল। ২২।

গল্‌তি নিষ্ঠার প্রথম লক্ষণ
নিজ চাহিদা প্রধান করা,
নিজ চাহিদা যা' সব ক'রে
পারলে ইষ্টচর্য্যা করা। ২৩।

নিষ্ঠাবিহীন প্রীতি যা'দের
স্বার্থপূজায় উচ্ছলা,
নাইকো প্রীতি একটু তা'দের
নিষ্ঠাও তা'ই চঞ্চলা। ২৪।

অর্থকরী ইষ্টচর্য্যায়
নিষ্ঠা-প্রীতির কমই দম,
স্বার্থপূজার অর্থ নিয়ে
আগ্রহ আনে ব্যতিক্রম। ২৫।

ফাঁকিবাজি ধাপ্পা দিয়ে
প্রিয়র থেকে নেওয়ায় সুখ,
প্রিয় তোমার কোথায় ক্রিয়?
দীর্ণ করলি নিজের বুক! ২৬।

ভালবাসার নাইকো তেজ
মাথা নেড়ে করে হুঁ,
প্রেষ্ঠ নেশার মিথ্যা ভড়ৎ
স্বার্থসেবার রং বহু। ২৭।

ভালবাসিস্ অনেক বলিস্
নিদেশ মেনে চলিস্ না,
ঠিকই জানিস্ প্রিয়কে তুই
স্বার্থ ছাড়া মানিস্ না। ২৮।

প্রণয় রে তোর ব্যবসাদারী
স্বার্থসেবায় সংক্ষুধ,
উন্নতি তোর হবে কিসে
প্রেয়ার্থেই যে অক্ষুধ। ২৯।

প্রিয়'র স্বপন দেখুক যতই
প্রিয়'র কথা বলুক না,
সক্রিয় দরদী না হ'লে
আস্থা তা'তে রেখো না। ৩০।

প্রীতির বাহানা ক'রছ কেবল
দরদ তা'তে নাই,
ডুবলি যে তুই অতল জলে
ব্যর্থ জীবনটাই। ৩১।

প্রীতির ধাপ্পাবাজি নিয়ে
ক'রতে বিভব আত্মসাৎ,
দুর্দ্দৈব যা' ক'রছ সৃষ্টি–
তোমাতেও তা' হানবে ঘাত। ৩২।

প্রীতির নেশা নাই–তবুও
এমন যা'রা প্রীতি দেখায়,
নেবার ফন্দী ধুরবাজিতে
চলা-বলা সবই চালায়। ৩৩।

ধাপ্পাবাজি ফাঁকির ভড়ৎ
ভন্ডচালের কুটিল ছল,
ক'দিন চলে তা' বলে আর?
নিয়েই যায় তা' রসাতল। ৩৪।

ফাটবে যখন ফুটবে যখন
ধাপ্পাদরদ আগুন হ'য়ে,
ফাগুন-মাসের রং তামাসা
তখনও কি তোর চ'লবে ব'য়ে? ৩৫।

অন্তরে তোর পুষলে বিষাদ
নিষাদ হ'য়ে লাগবে পাচ্ছ,
প্রেষ্ঠকে তোর ছিনিয়ে নেবে
থাক্‌বি না আর তাঁহার কাছ। ৩৬।

লোভের বাণে নিঠুর টানে
শূন্য ক'রে হৃদয় তোর,
মাতাল নিষাদ ব্যভিচারে
রাখ্‌লি না তুই প্রেষ্ঠে ভোর। ৩৭।

শিশুকথা

শ্রীদেবীপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়

যেসব শিক্ষক বা অভিভাবক শিশুর এই সংস্কার-অনুপাতিক গুণরাজিকে অবজ্ঞা ক'রে তার শিক্ষার ব্যবস্থা করেন, তাঁরা শিশুর কাছ থেকে ঐ বিশেষ গুণের যে বৃহত্তম বিকাশ হ'তে পারত তা' আর কখনও পাবেন না। ঐ গুণ চিরতরে হারিয়ে বা চাপা প'ড়ে যাবে। সমাজ তার দ্বারা যে উপকার পেতে পারত, তা' থেকে বঞ্চিত হবে। তা' ছাড়া, লোকলোচনের অগোচরে আর একটা ভয়ঙ্কর ক্ষতি সাধিত হয়। শিশুর অন্তরের বিশেষ ঝোঁকটি যদি ফুটে ওঠার সহজ রাস্তা না পায় তাহলে অনেক সময় বাঁকা পথ ধ'রে বিকৃতরূপে তা' দেখা দেয়। যেমন, নদীর স্বাভাবিক গতিপথ যদি রুদ্ধ ক'রে দেওয়া যায় তাহলে সে উপচে উঠে গ্রাম, ধানক্ষেত ভাসিয়ে নিয়ে যাবে, এও অনেকটা সেইরকম। ফলে, শিশু বড় হ'য়ে একটা নৈরাশ্য ও অসন্তোষভরা জীবন নিয়ে কাল কাটাতে থাকে। কারো হয়তো স্বাভাবিক ন্যাক ছিল জ্ঞানচর্চ্চার দিকে। ছোটবেলা থেকেই সাহিত্য, দর্শনের উপরে তার সহজ ঝোঁক। বড় হ'য়ে সে হয়তো একজন সুগবেষক বা অধ্যাপনা হ'তে পারত। কিন্তু অভিভাবক বা পরিস্থিতির চাপে তাকে ইঞ্জিনীয়ারিং পড়তে হ'ল বাধ্য হ'য়ে। সেটা কিছুতেই তার পছন্দের সাথে খাপ খায় না। জোর ক'রে অভ্যাস করতে যেয়ে সে না হতে পারল ভাল ইঞ্জিনীয়ার, তার স্বাভাবিক সাহিত্যপ্রীতিও সে হারালো। তারপর হয়তো একটা কারখানার শ্রমিক হ'য়ে কোনরকমে দিন গুজরাতে থাকলো। তখন তার ভেতরের প্রবল অতৃপ্ত আকাঙ্ক্ষা হয়তো কিছু অসৎসঙ্গী বা বদনেশার মধ্যে জড়িয়ে প'ড়ে তার জীবনটাকে তছনছ করে দিল। এ চিত্র আমাদের আশেপাশে খুব বিরল নয়। শিশুর সংস্কার অনুপাতিক ঝোঁক অবহেলা ক'রে শিক্ষা দেওয়ার ফল এতখানি পর্য্যন্ত ক্ষতি করতে পারে। এ বিষয়ে আমরা কতখানি সজাগ?

সংস্কারের এই প্রথম জাগরণের বয়সে সবার যে শুভ সংস্কারই কেবল জাগে তা'নয়। অনেকের অনেক অসৎ সংস্কারও জেগে ওঠে, সেটা তার পূর্ব্বজন্ম থেকে আহরণ করা। সেই সময় অভিভাবকদের খুব খেয়াল ক'রে ঐ অসৎ ব্যবহার ও আচরণগুলি কৌশলে নিয়ন্ত্রণ করতে হয়। তা' না করলে ভবিষ্যতে সেগুলি শিশুর জীবনে ক্ষতিকারক হ'য়ে ওঠে। দুঃখের বিষয়, ঐ পাঁচ-সাত বছর বয়স পর্য্যন্ত আমরা সাধারণতঃ শিশুদের দিকে বিশেষ লক্ষ্য দিই না। তাদের চিন্তা, চলন ও মানসিকতা সুষ্ঠুভাবে গ'ড়ে তোলার দিকে কোন খেয়ালই করি না।

অনেক সংসারে বলতে শোনা যায়, 'এখনও তো লেখাপড়ার বয়স হয় নি। আস্তে আস্তে বুদ্ধি খুলবে।' ঐ বয়সে শিশু হয়তো কাউকে গালাগালি করল (যেটা সে কোন বয়স্ক লোকের মুখেই শুনে শিখে রেখেছে), তা' শুনে বড়রা হাসাহাসি করেন। কেউ-কেউ আবার ঐ রকম বলা বলতে শিশুকে উৎসাহ দেন। ফলে, শিশুর আরো কয়েকটি খারাপ কথা বা অশালীন গালাগাল শেখা হ'য়ে যায়। ভাষা মানুষের চরিত্র ও ব্যবহারকে অনেকখানি স্পর্শ করে। অসভ্য, অশ্লীল ভাষা আচার-আচরণকে ক'রে তোলে উচ্ছৃঙ্খল, দুর্ব্বিনীত। দেখা যায়, যে সংসারের ভাষা খুব রূঢ় ও অমার্জ্জিত, সেখানকার লোকদের ব্যবহারও হয় কাঠখোট্টা। বিশুদ্ধ, বিনয়সমন্বিত ভাষা ও শব্দের প্রয়োগ উন্নত মানসিকতারই পরিচয় বহন করে।

আবার, তিন-চার বছরের শিশু হয়তো রেগে কাউকে লাথি মারছে বা তার দিকে পা ছুঁড়ছে। আমরা গুরুজনরা অনেক সময় এ ব্যাপার হেসে উড়িয়ে দিই। ভাবি, ও ছেলেমানুষের ব্যাপার। বড় হ'লেই সেরে যাবে। কিন্তু বড় হ'লেও স্বভাব তো সারেই না, বরং বেড়ে যায়। লাথি মারা ব্যবহারটা আরো নতুন-নতুন হিংসাত্মক রূপ নিয়ে ফুটে ওঠে।

অনেক সময় শিশুরা কোথাও প'ড়ে যেয়ে যখন ব্যথা পায়, অভিভাবকরা বলেন, 'তুমি ঐ জায়গাটাতে মেরে দাও।' শিশু দাঁড়িয়ে উঠে ঐ প'ড়ে যাওয়ার জায়গাটাতে লাথি মারে, কিল মারে। তারপর শান্ত হয়। এ অভ্যাস ভয়াবহ। এতে শিশুর জীবনের দুটি ক্ষতিসাধন করা হয়। এক নম্বর হ'ল, তার অন্তরে হিংসা প্রবৃত্তি যাতে তালমত প্রশ্রয় পায় তার ব্যবস্থা করা হয়। অন্তর তার রুক্ষ হ'য়ে ওঠে ক্রমশঃ। কাউকে অপছন্দ করলে বা কেউ তার অহংকারে আঘাত দিলে সে তার বিরুদ্ধে প্রতিশোধ নিতে ও তাকে জব্দ করতে চায়। দ্বিতীয়তঃ সে নিজের ত্রুটি আবিষ্কার করতে কখনও শেখে না। নিজে গুরুতর অন্যায় করলেও তার জন্য সে অপরকেই দায়ী সাব্যস্ত করে। বলে, 'অমুকের জন্যই তো এই কাণ্ড হ'ল'। এর ফলে, নিজেকে সে কখনও পরিশুদ্ধ করতে পারে না, হ'য়ে ওঠে একটা দোষে-ভরা মানুষ। ধীরে ধীরে সে মানুষের সহানুভূতি হারায়। নানারকম দুঃখ তাকে ঘিরে ধরে।

আমাদের পরিবারে ও সমাজে যে-লোকটি এইরকম দুঃখ পাচ্ছে, তার সেই দুঃখের কারণ খোঁজ করতে গেলে বেরিয়ে পড়বে শৈশবের ঐরকম কোন ঘটনা। তখন যেটা অতি সাধারণ নির্ম্মল হাসির ঘটনা বলে মনে হয়েছিল, যথাযথ পথে নিয়ন্ত্রিত না করার জন্য সেটা এখন কুৎসিত করালবদনে আত্মপ্রকাশ করছে। এইভাবে অজান্তে আমরা যে কত শিশুর জীবনের সর্ব্বনাশ সাধন ক'রে দিই তার ইয়ত্তা নেই। আন্তর্জ্জাতিক শিশুবর্ষ নিয়ে যতরকম চিন্তাভাবনা হয়ে গেল তার মধ্যে এগুলির স্থান কি প্রধান থাকা উচিত নয়?

মানসতীর্থ পরিক্রমা

সুশীলচন্দ্র বসু

মহাত্মাজী

দেশবন্ধু দার্জ্জিলিং যাওয়ার ঠিক পরেই, মহাত্মাজী চিররঞ্জনকে আশ্রমে পত্র দিয়ে জানান যে তিনি আশ্রম পরিদর্শন করতে যাবেন । উত্তরে চিররঞ্জন তাঁকে লেখেন যে পাবনা এলে তিনি ও তাঁর সঙ্গে যাঁরা আসবেন, সকলেই যেন আশ্রমে এসে প্রথম ওঠেন ও আমাদের আতিথ্য গ্রহণ করেন ।

মহাত্মাজী আসবেন শুনে আমরা তাঁর সম্মানার্থে সবাই খদ্দরের বাস পরিধান ক'রে অভ্যর্থনার জন্য প্রস্তুত থাকলাম । আশ্রমের ছেলেমেয়েরা চরকা কাটায় অভ্যস্ত হ'তে থাকল । মহাত্মাজী পত্রে জানালেন যে তিনি ২৩ শে মে (১৯২৫ সাল) দুপুরে ঈশ্বরদি আসবেন এবং সেখান থেকে সরাসরি আশ্রমে আসবেন ।

তাঁর চিঠি পেয়ে আমি ও চিররঞ্জন যথাসময়ে শান্তাহার ষ্টেশনে গিয়ে তাঁর গাড়ীতে উঠলাম এবং তাঁকে অভ্যর্থনা জানালাম । কিন্তু ঈশ্বরদি ষ্টেশনে গাড়ী পৌঁছুলে, পাবনার Reception Committee-র Chairman যোগেন্দ্রনাথ মৈত্র তাঁর গাড়ীতে এসে তাঁকে অভ্যর্থনা জানালেন এবং পাবনা যাবার জন্য জিদ করতে লাগলেন ।

মহাত্মাজী বললেন–"আমি এঁদের কথা দিয়েছি যে প্রথমে আশ্রমে যাব; সেখানে খাওয়া-দাওয়া ক'রে পাবনায় আসব ।"

যোগেনবাবু জিদ করতে লাগলেন "তা কিছুতেই হ'তে পারে না । আপনি প্রথমে আমাদের ওখানে যাবেন, তারপর আশ্রমে যাবেন । Reception Committee-র Chairman হিসাবে আমি এসেছি আপনাকে অভ্যর্থনা করতে, কাজেই আপনি আমাদের ওখানে আগে যাবেন । আমাদের এই অনুরোধ আপনি কিছুতেই এড়াতে পারবেন না ।"

মহাত্মাজী, আমার ও চিররঞ্জনের দিকে তাকিয়ে অত্যন্ত দুঃখিত ভাবে বললেন,–"See, how helpless I am!"

মহাত্মাজীর সঙ্গে কৃপালিনী ছিলেন । যোগেনবাবু জেদ দেখে তিনি উত্তেজিত হ'য়ে বললেন–"আপনি কি রকম লোক? You must comply with the wishes of Mahatmaji!"

কিন্তু যোগেনবাবু নাছোড়বান্দা! তখন মহাত্মাজীর শোচনীয় অবস্থা দেখে আমরাই বললাম—"মহাত্মাজী, আপনি আগে পাবনাই যান । সেখানেই প্রথম আতিথ্য গ্রহণ করুন ।"

তা'তে মহাত্মাজী যেন হাঁপ ছেড়ে বাঁচলেন, এই সঙ্কট থেকে উদ্ধার পেয়ে । আমরা মহাত্মাজী সহ Reception Committee-র Chairman-এর বাড়ী গিয়ে উঠলাম । তারপর সেখানে বিশ্রামান্তে মহাত্মাজীকে সঙ্গে নিয়ে বাজিতপুর ষ্টিমারঘাটের কাছে এসে মোটর থেকে নেমে, নৌকা ক'রে আশ্রমে এলাম ।

ষ্টিমারঘাটে একটা বিচিত্র ঘটনা ঘটে । মহাত্মাজী যখন মোটর থেকে নেমে নৌকার দিকে এগোচ্ছেন– তখন হঠাৎ আমাদের আশ্রমের কর্ম্মী, হেমগোবিন্দ মুন্সী ছুটে এসে মহাত্মাজীকে গভীরভাবে আলিঙ্গন ক'রে দু'গালে চুমা খেতে লাগল । মহাত্মাজী চীৎকার ক'রে বললেন–'এ ক্যায়া রে? এ ক্যায়া রে? তখন বাধ্য হ'য়ে আমাকে বলতে হ'ল–এ-একটা পাগল । এই বলে মহাত্মাজীকে তার আলিঙ্গন হ'তে, জোর ক'রে মুক্ত করলাম ।

নৌকা আশ্রমে এসে উপস্থিত হ'লে দেখা গেল- সমস্ত আশ্রম লোকে লোকারণ্য, তিল ধারণের স্থান নাই । তার মধ্যেও মহাত্মাজী আবার হেমগোবিন্দকে দেখে বলে উঠলেন–"Beware of that man!"...এত ভীড়েতে শ্রীশ্রীঠাকুরের সঙ্গে মহাত্মাজীর কোন আলাপ-আলোচনা বা কথা বার্ত্তাই সম্ভব হ'ল না ।

জননী মনোমোহিনী আশ্রমে কর্ত্তার Cottage-এর বারান্দায় মহাত্মাজীর গলা জড়িয়ে ধ'রে আমাকে বললেন–মহাত্মাকে বল- "তুমি জগতের কাছে মহাত্মা হ'তে পার, আমার কাছে তুমি ছেলে; আমি ছেলে হিসাবেই তোমাকে দেখি ।"

আমি সেকথা মহাত্মাজীকে বুঝিয়ে বলাতে মহাত্মাজী খুব হাসলেন । মা মহাত্মাজীকে বললেন–"তোমার খাবার জন্য যে-সব জিনিষপত্র, ফলমূলাদি আমরা আয়োজন ক'রে রেখেছিলাম তা' তোমার সঙ্গে দিলাম । তুমি তো আর আমাদের এখানে খেলে না, তবে তুমি কিছু গ্রহণ করলে আমি খুশী হব ।"

মহাত্মাজী সানন্দচিত্তে সে-সব সঙ্গে ক'রে নিয়ে গেলেন ।

আশ্রম পরিদর্শনান্তে মহাত্মাজী আশ্রমের Visitor's Book-এ যে মন্তব্য লিখে রেখে গেলেন, তা'তে তিনি চরকার কথাই বিশেষ ক'রে বলে গেলেন,–চরকাকেই যেন বিশেষ ও প্রধান স্থান দেওয়া হয় । তিনি আমাকে আরো ব'লে গেলেন যে আপনারা খাদি-প্রতিষ্ঠান থেকেই চরকা নিয়ে আসবেন । সতীশ দাশগুপ্ত, যিনি তৎকালে বাংলার গান্ধী ব'লে খ্যাত হয়েছিলেন–তাঁকে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন আমাদের চরকার সব সাজ-সরঞ্জাম দেবার জন্য ।

এই প্রসঙ্গে দেশবন্ধু C. R. Das-এর একটা কথা মনে পড়ল । যখন দেশবন্ধু আশ্রমে এসেছিলেন তখন

তাঁকে আশ্রমের প্রতিষ্ঠানগুলি আমি ঘুরে-ঘুরে দেখাতে লাগলাম–বিজ্ঞান-কুটীর, Cross breeding of plants and flowers এবং আরো অন্যান্য শিল্প-বিভাগ । তখন সব দেখতে-দেখতে তিনি আমাকে বলেছিলেন–"মহাত্মাজীকে এ-সব বেশী কিছু দেখাবেন না, তিনি এ-সব appreciate করবেন ব'লে মনে হয় না । তাঁকে চরকা এবং খদ্দরেরর যা' কিছু আছে তাই দেখাবেন ।"

আশ্রমে ঘুরে যাবার দিন দশেক পর মহাত্মাজী দার্জ্জিলিং-এ যান এবং সেখানে দেশবন্ধুর সান্নিধ্য কয়েক দিন যাপন করেন । এই অবসরে তাঁদের মধ্যে যে অন্তরঙ্গ আলাপ হয় তার আধিকাংশই শ্রীশ্রীঠাকুরের সাহচর্য্যে, দেশবন্ধুর স্বভাব ও দৃষ্টিভঙ্গির আমূল পরিবর্ত্তন প্রতিফলিত করে । ব্যক্তি, সমাজ ও রাষ্ট্রজীবনে ধর্ম্মের পথই একমাত্র পথ–তাঁর মনে এই বদ্ধমূল ধারণা মহাত্মাজীকে বিস্মিত করে । দেশবন্ধুর মৃত্যুর পর, বিভিন্ন পত্রিকায় মহাত্মাজী এই ক'দিনে যা লিখেছিলেন, তা' থেকেই সেটা পরিস্ফুট হবে ।

.....

'নবজীবন'–২৮. ৬. ২৫ দেশবন্ধুর বদ্‌মেজাজের পরিচয় অনেকেই আগে পেয়েছেন কিন্তু ফরিদপুরে প্রথম আমি তাঁর স্বভাবে যে মিষ্টতার স্বাদ পেলাম তা' যেন তারপর থেকে বেড়েই চললো... দার্জ্জিলিং এ এসে লক্ষ্য করলাম তাঁর এই নবকলেবরের পূর্ণ পরিণতি । আমার সেই পাঁচদিনের (দার্জ্জিলিং এ দেশবন্ধুর সাহাচর্য্যের) অভিজ্ঞতার কথা বল্‌তে আমার ক্লান্তি নেই–তাঁর প্রতি কথায় ও কাজে যেন শুধু প্রেমেরই অভিব্যক্তি ।

'Young India'–১৬. ৬. ১৯২৫-এই মহান দেশপ্রেমিকের সাথে দার্জ্জিলিং এ পাঁচদিনের সাহচর্য্য আমাদের ভেতর এক অপূর্ব্ব অন্তরঙ্গতা সৃষ্টি করেছিল । তখনই বুঝেছিলাম যে তিনি শুধু বিরাট মানুষই ন'ন, একটি নিখাদ মানুষ । ভারত একটি রত্ন হারালো!

'Young India'–২৫. ৬. ১৯২৫-এই পাঁচটি অমূল্য দিনে তাঁর প্রতিটি কাজই ছিল তাঁর গভীর ধর্ম্মভাবের দ্যোতক ।

'নবজীবন'–২৮. ৬. ১৯২৫=দার্জ্জিলিং এ তাঁর কাছে যখন যাই, তখন তিনি বাড়িতে মাছ মাংস ঢুকতে দিতেন না । তিনি আমাকে বার-কয়েকই বলেছিলেন, "পারলে আর কখনও মাছ-মাংস খাব না । আমার খেতে ভাল লাগে না আর তা'তে আধ্যাত্মিক বিকাশেরও বাধা ঘটে । আমার গুরুদেব বিশেষভাবে বলেছেন, আমি এখন যে সাধনার পথ ধরেছি তা'তে আমার পক্ষে আমিষ বর্জ্জন করাই বিধেয় ।"

'Young India'-(At Darjeeling) 16. 7. 1925=দেশবন্ধুর বাড়ীতে আমি পূর্ব্বেও আতিথ্য গ্রহণ করেছি কিন্তু সে সব সাক্ষাৎ হ'য়েছিল নিছক রাজনীতিকেই কেন্দ্র ক'রে; নিজ নিজ নির্দ্ধারিত কর্ম্মের গণ্ডীতেই আমরা ছিলাম আবদ্ধ । দার্জ্জিলিং এর ব্যাপার আলাদা, সেখানে তাঁকে আমি একান্ত আপনার জনের মতোই পেয়েছিলাম । তিনি গিয়েছিলেন বিশ্রাম নিতে আর আমি তাঁর সান্নিধ্য কামনায় । আমার বিশ্রামের কথাটা ছিল ওজুহাত মাত্র, দেশবন্ধু সেখানে না থাকলে তুষার-শোভিত শৈলশৃঙ্গের শোভা আমি উপেক্ষাই করতাম । হালে তিনি আমায় পেন্সিলে লেখা চিরকুট পাঠানো সুরু করেছিলেন,–তারই একটায় লিখলেন, "মনে থাকে যেন, আমি হচ্ছি অভ্যর্থনা সমিতির অধ্যক্ষ, আপনি এখন (বাংলা সফরের সময়ে) আমার আওতায় আছেন! দার্জ্জিলিং এ আসতেই হবে, এই আমার নির্দ্দেশ!" তাঁর সেই মধুর পত্রগুলি যদি রেখে দিতাম ।

ঠিক রোগশয্যায় না হ'লেও তিনি তখন আরোগ্য-শয্যায়, তাঁর নিজেরই সেবার প্রয়োজন । তা' সত্ত্বেও আমার ও সঙ্গীদের সুখ সুবিধার প্রত্যেকটি খুঁটিনাটি নিজেই ব্যবস্থা করতেন, আর সে ব্যবস্থাও এক এলাহি ব্যাপার!

তাঁর এই ধরণের আলাপের প্রসঙ্গে ছেদ টেনে পাঠকদের জানিয়ে রাখি যে ক্রমে যে সব কথা হ'লো তা' আধ্যাত্মিক রসালাপেরই নামান্তর–তিনি অনর্গল বলে যেতে লাগলেন, তখন তিনি কি করছেন, গায়ে একটু জোর পেলেই বা কি করতে মনস্থ করেছেন । তাঁর গভীর আধ্যাত্মিক জীবনের সম্বন্ধে আমার কোনও ধারণাই ছিল না; জানতাম না যে একাধিক অভিজাত বাঙ্গালীর মতো এটাই তাঁর জীবনের নিয়ামক বৃত্তি । এই আলাপের পরই তা' প্রকাশ পেল । বছর চারেক আগে, মনে পড়ে, গঙ্গাতীরে কুটীর বেঁধে বাস করার ইচ্ছা তিনি একবার প্রকাশ করেছিলেন; তখন আমি রহস্য করে বলেছিলাম,–কুটীর তৈরী হ'লে আমিও তাঁর সাথী হব । দার্জ্জিলিংএ আমার ভুল ভাঙ্গল । স্পষ্টই বুঝলাম, রাজনীতির ক্ষেত্রে যেন তিনি পথভোলা পথিকের মতোই এসে পড়েছেন, ধর্ম্মজীবনেই যেন তাঁর স্বভাবজ আগ্রহ ।

.....

এই সকল উক্তি থেকে বোঝা যায় দেশবন্ধুর চরিত্র মহাত্মাকে কিভাবে প্রভাবিত করেছিল । কিন্তু দেশবন্ধু নিজে যাঁর দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন তাঁর প্রভাব মহাত্মার ওপর বিশেষ প'ড়লো না । প'ড়লে হয়তো আধুনিক ভারতের ইতিহাস অন্যভাবে রচিত হ'তো ।

আশ্রমে সন্দর্শনে মহাত্মাজী সেভাবে প্রভাবিত হ'ননি দেখে তিনি তাঁকে পুনরায় আশ্রমে গিয়ে শ্রীশ্রীঠাকুর সান্নিধ্যে কিছুদিন বাস করতে সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ করে । শ্রীশ্রীঠাকুর সম্পর্কে দেশবন্ধুর রোগশয্যার এই উক্তি, ১৬ই জুলাইয়ের 'Young India' পত্রিকায় মহাত্মাজী এইভাবে লিপিবদ্ধ ক'রে গেছেন,–

I have learnt from my Guru, the value of truth in all our dealings. I want you to live with him for a few days at least. Your need in not the same as mine. But he has given me strength, I did not possess before. I see things clearly which I saw dimly before.

১৬ই জুন ১৯২৫ সাল–দার্জ্জিলিংএর 'Step Aside' বাড়ীতে দেশবন্ধুর মৃত্যু হয় । সেদিন তাঁর শয্যাপার্শ্বে সর্ব্বক্ষণের জন্য আমাদের শ্রদ্ধেয় মনোহরদা উপবিষ্ট ছিলেন । তাঁর মুখে শুনেছি, দেশবন্ধু মৃত্যুর পূর্ব্বমহূর্ত্তে,–"ভোম্বল! আমি পাবনা যাব,"– এই কথা কয়টি ব'লে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন ।

কলকাতায় দেশবন্ধুর শ্রাদ্ধবাসরে শ্রীশ্রীঠাকুরের পূর্ণাবয়ব প্রতিকৃতি কুসমদামে সজ্জিত ক'রে রাখা হ'য়েছিল । জননী মনোমোহিনী সহ আমরা সেখানে উপস্থিত ছিলাম । শ্রীশ্রীঠাকুর যাননি ।'

এই শ্রাদ্ধ-উপলক্ষে যখন মহাত্মাজী কলকাতায় আসেন তখন তিনি স্বয়ং ও ড. রাজেন্দ্রপ্রসাদ শ্রীশ্রীঠাকুরের সঙ্গে দেখা করতে এসেছিলেন অখিল মিস্ত্রি লেনের বাড়ীতে । শ্রীশ্রীঠাকুর তখন সেই বাড়ীতে অবস্থান করছিলেন । তখন তিনি শ্রীশ্রীঠাকুরকে বলেছিলেন, "আপনার সংস্পর্শে এসে দেশবন্ধুর যে অদ্ভুত মানসিক পরিবর্ত্তন সাধিত হয়েছে তা' দার্জ্জিলিং-এ তাঁর সাথে আলাপ ক'রে বেশ বুঝতে পেরেছি ।"

এই সময়ে মতিলাল নেহেরু কলকাতায় এসে দেশবন্ধুর জামাতা ব্যারিষ্টার সুধীর রায়ের গৃহে ওঠেন । এইখানে তাঁর সাথে আমার দ্বিতীয় ও শেষবারের মতো আলাপ হয় । দেশবন্ধু শ্রীশ্রীঠাকুরের সংস্পর্শে আসার পর তাঁর মানসিক পরিবর্ত্তন যা' তিনি লক্ষ্য করেছিলেন, সেদিনকার আলাপের তাই ছিল বিষয়বস্তু ।

দেশবন্ধুর মৃত্যুতে শোকাকুল দেশবাসী, তাঁর সহধর্ম্মিণী বাসন্তী দেবীকেই দেশের নেত্রীরূপে চেয়েছিলেন । শ্রীশ্রীঠাকুর চিররঞ্জনকে দিয়ে বাসন্তী দেবীকেই জানিয়েছিলেন যে এই সময়ে শোকবিহ্বল না হ'য়ে, তিনি যেন তাঁর স্বর্গতঃ স্বামীর পদাঙ্ক অনুসরণ ক'রে তাঁরই প্রারব্ধ কার্য্যের ভার গ্রহণ করেন;–কলিকাতা কর্পোরেশনের মেয়র, বেঙ্গল কংগ্রেসের সভাপতির পদ এবং দৈনিক 'ফরোয়ার্ড' কাগজের সম্পাদকের কার্য্যভার গ্রহণ ক'রে অগ্রসর হন–পুত্র চিররঞ্জনকে সঙ্গে নিয়ে । তা' হ'লে সেও কালক্রমে এই দায়িত্ব গ্রহণ ক'রে দেশের সেবা করতে পারবে ।

বাসন্তী দেবী, শোকাভিভূতা হ'য়েই হো'ক বা অন্য কোন কারণেই হো'ক শ্রীশ্রীঠাকুরের সে কথার মর্য্যাদা রক্ষা ক'রে উঠতে পারেননি । এমন কি, দেশবন্ধু মৃত্যুকালে তাঁকে যে অনুরোধ ক'রে গিয়েছিলেন, একবার শ্রীশ্রীঠাকুরের সঙ্গে দেখা করতে, তা'ও তিনি রক্ষা করতে পারেননি । এ-কথা আমি বাসন্তী দেবীর মুখেই শুনেছিলাম ।

দেশবন্ধুর মৃত্যুর কিছুকাল পরে আমি একদিন তাঁর নফর কুণ্ডু রোডের বাড়ীর ধার দিয়ে যাচ্ছিলাম । তিনি তখন দোতালার বারান্দায় দাঁড়িয়েছিলেন । আমাকে রাস্তা দিয়ে যেতে দেখে ও চোখে চোখ পড়তেই অঙ্গুলি-সঙ্কেত দ্বারা ডাকলেন । দোতালায় উঠে গিয়ে তাঁর কাছে দাঁড়ালাম । তিনি আমাকে বসতে ব'লে, নিজে গিয়েই আমার জন্য সরবৎ এবং ফল নিয়ে এসে খেতে দিলেন, আর সেই সঙ্গে কথা বলতে লাগলেন । বললেন–"তিনি (অর্থাৎ দেশবন্ধু) মৃত্যুশয্যায় আমাকে একটা অনুরোধ ক'রে গিয়েছিলেন সেটা আমি রাখতে পারিনি । সেজন্য মনে-মনে দুঃখও পাই । কিন্তু প্রবল বাধা । সে বাধা আমি কিছুতেই অতিক্রম করতে পারছি না ।"

শুনে আমি আশ্চর্য্য হ'য়ে বললাম–"কি বলছেন মা! আপনার স্বামী ভুবনবিখ্যাত; এ-হেন স্বামীর স্ত্রী হ'য়ে তাঁর মৃত্যুশয্যার অনুরোধ রাখতে পারলেন না-এ কেমন কথা? যতই বাধা হোক, তা' যে-কোন রকমে অতিক্রম ক'রে তাঁর শেষ অনুরোধ রক্ষা করা কি উচিত নয় মা! আর বাধাটাই বা এমন কি গুরুতর যে আপনি তা' অতিক্রম করতে পারছেন না?"

তখন তিনি অশ্রুসিক্ত চোখে ধীরে-ধীরে বললেন–তিনি মৃত্যু শয্যায় শুয়ে আমাকে অনুরোধ ক'রে গিয়েছিলেন, শ্রীশ্রীঠাকুরের সঙ্গে আমি যেন একবার দেখা করি । আমি তাঁর সে কথা রাখতে পারিনি ।

আমি শুনে আশ্চর্য্যান্বিত হ'য়ে বললাম–"সেকি? চলুন না! আজই আপনাকে সঙ্গে ক'রে শ্রীশ্রীঠাকুরের কাছে নিয়ে যাচ্ছি ।"

তিনি তখন গম্ভীর হ'য়ে বললেন–"অত সহজ হ'লে আমি নিজেই তো যেতে পারতাম । যাওয়ার অন্তরায় আমার দুর্জ্জয় অভিমান । তিনি মারা গেলে 'ঠাকুর' তো আমাকে একদিনের তরেও ডাকলেন না!"

আমি-মা, অভিমান আপনার যতই থাক না কেন, মৃত স্বামীর কথা স্মরণ ক'রে, তাঁর মরজগতের শেষ অনুরোধ রক্ষা করবার জন্য, সেই অভিমানকে জলাঞ্জলি দেওয়া উচিত নয় কি মা?

তিনি বললেন–উচিত সেটা তো বুঝি, কিন্তু সেটা তো কিছুতেই পারছি না ।

তারপর বাসন্তী দেবী একবার এটর্ণী অসীম দত্তের সঙ্গে দেওঘর এসেছিলেন, N.C.Chatterjee ব্যারিষ্টারের সঙ্গে দেখা করবার জন্য । নির্ম্মলবাবু তখন শ্রীশ্রীঠাকুরের সান্নিধ্যে কালযাপন করবার জন্য ঠাকুর-বাংলোর নিকটে রঙ্গনভিলায় ছিলেন । বাসন্তী দেবী রঙ্গনভিলাতে এলেন কিন্তু ঠাকুর-বাংলোয় গেলেন না!

প্রেমল ঠাকুর

শ্রীপ্রলয় মজুমদার

স্যুটকেশ পাশে রেখেই কাকা ঠাকুরের সামনে এগিয়ে এলেন। বাবার লেখা চিঠি বার করে পরিচয় দেবার আর কোন প্রয়োজন হলো না। কাকা ঠাকুরের দিকে তাকিয়ে আপাদমস্তক ভালো করে পর্য্যবেক্ষণ নিরীক্ষণ করতে লাগলেন তার মতো করেই। তারপরে, একেবারে সোজা সামনে এসে কোমরে হাত দিয়ে কাকা দাঁড়ালেন ঠাকুরের চোখের দিকে চেয়ে সোজা জিজ্ঞাসা,–আপনি কি ভগবান দেখেছেন? আমাকে দেখাতে পারেন? ঠাকুর আমার কাকার সমস্ত রাত্রি জাগরণের চিন্তিত চেহারাটা দেখেই কেমন ব্যস্ত হয়েই বললেন,–চুপ কর। পচাল পাড়িস না। অতদূর থেকে রাত জ্যাগে আইছিস্। আগে জামাকাপড় ছ্যাড়ে, স্নান করে খ্যায়ে দ্যায়ে ভালো করে ঘুমায়ে বিশ্রাম করে তুই সুস্থ হয়ে নে তো। তারপর বিকালে কথা হবি, না কি কোস্?

আমার কাকা এমন অভূতপূর্ব দরদী মনের আপ্যায়ণ জীবনে কোন দিনও পাননি। ফলে, –একেবারে অভিভূত আপ্লুত আমার কাকা। ঠাকুরই সব ব্যবস্থা করলেন, আমার কাকার থাকার, খাওয়ার আর বিশ্রামের। সঙ্গে আবার একজন লোকও দিলেন।

বিকালে ঠাকুর প্রণাম করে বসতেই ঠাকুর জিজ্ঞাসা করলেন, তোর বিশ্রাম কেমন হইছে?

ঠাকুরের কথা শুনে কাকা সামান্য সৌজন্যতার হাসি হাসলেন। ঠাকুর জিজ্ঞাসা করলেন,–ভগবান দিয়ে তোর কাম কি?

এমন জিজ্ঞিাসায় আমার কাকা অবাক হলেন। ফ্যাল ফ্যাল করে তাকালেন ঠাকুরের দিকে। ঠাকুর বললেন,–ভগবান থাকলেই বা তোর কি, আর না থাকলেই বা তোর কি? ঠাকুরের এবারের জিজ্ঞাসায় কাকার ভিতরের সব প্রশ্নের ফর্দমালার ভিতরে কেমন তালগোল পাকিয়ে সব কিছুর পরিবর্ত্তন হতে শুরু করলো। কোনভাবেই যেন জিজ্ঞাসার শরীরকে তিনি আর কোনমতেই স্পর্শ করতে পারছেন না। ঠাকুর আবার জিজ্ঞাসা করলেন কাকাকে,–আমি কই, তুই আছিস, তো?

আমার কাকা একেবারে ঠাকুরের সামনে। সোজাসুজি বসে। কাকার সামনে ধবধবে সাদা চাদর পাতা চৌকিতে বসে, ডান দিকের হাঁটুর উপরে ডান হাতের কনুই এর ভর করে সামনের দিকে সামান্য ঝুঁকে ঠাকুরের জিজ্ঞাসার মুখোমুখিই আমার কাকা।

সরাসরি ঠাকুরের দিকে দু'চোখের স্থির চাউনির সামনের খুব বেশীক্ষণ স্থির হয়ে দৃষ্টি রাখতে না পেরে, কোনও মতে আমতা আমতা করেই জানালেন,–

আজ্ঞে আমি তো আছি।

সঙ্গে সঙ্গে ঠাকুর জিজ্ঞাসা করলেন,– কেমন করে বুঝলি তুই আছিস?

ঠাকুর এবার স্থির। তাকিয়ে আছেন অপলক চাউনিতে। আমার কাকার দিকে চেয়েই। যেন এই জিজ্ঞাসার সরাসরি জবাবের প্রত্যাশায়। আমার কাকা ঠাকুরের দৃষ্টির সামনেই। কেমন যেন একটা টান টান উত্তেজনায় তিনি ভিতরে ভিতরে কাঁপছেন। ঘামছেন জামার ভিতেরই। কেমন অস্ফূট আমতা আমতা ভাবে বললেন,–এই তো আমি। এই যে আমি। আমার হাত পা শরীর সব নিয়েই তো আমি আপনার সামনে, আপনার সাথে কথা বলছি।

এ্যাই! এ্যাই হলো কথা। বলেই যেন ঠাকুর টানটান সেই উত্তেজনাকর মূহুর্ত্তের ইতি টানলেন। তারপরেই বললেন,–এ্যাই! এই পারিপার্শ্বিক সংঘাত থেকেই ভাব আর বোধে ধরা দেয়,–আমি বোধ। আমার সামনে যখন তুমি বলে কেউ থাকেন, তখনই যথার্থ অস্মিতা বোধ। তোর এই থাকাটাক্ই সাবুদ করে তোলা লাগে। বিধিমত চলায় যাতে তোর এই থাকাটা, সকলের সব রকম পারিপার্শ্বিক বৈশিস্ট্যক্ সামঞ্জস্যতায় অক্ষুণ্ন রাখে ক্রমমান্বয়েই ব্যাড়ে য্যাবের পারে সকলেক্ নিয়েই। আর তা-ই তো মানুষের কাম্য। না কি কোস্ তুই? সে সময়ে আর কিছু বলতে পারলেন না আমার কাকা। ভাবছিলেন বসে বসেই।

আমার কাকা তারপরেও বেশ কিছুদিন কাটালেন ঠাকুরের কাছে। পরবর্ত্তীকালে ঠাকুরের সাথে অনেক কথাবার্ত্তা আলাপ আলোচনাতেই কাকা অনুভব করলেন যে, –ঠাকুরই হলেন আমার অন্বেষণের প্রধান অস্তিত্ব। ঠাকুরের কাছে দীক্ষার জন্য প্রার্থনা জানালেন। একই সাথে কাকার দীক্ষা আর স্বস্ত্যয়নী ব্রত গ্রহণ হলো। আশ্রমেরই একজন নিয়ত কর্মী হয়ে কাজ

করার জন্য কাকা ঠাকুরকে জানালেন । প্রত্যেকদিনই তিনি ঠাকুরকে জোরাজুরি করতেন । শেষে দিন কয়েক বাদে ঠাকুর রাজী হলেন । আশ্রমের ভিতেরই ঘরের ব্যবস্থা করে দিলেন । তারপর পরম স্নেহের সাথেই আমার কাকাকে বললেন,–শোন্ তুই কিন্তু আমার কাছে থাকফি । যেখানে যে ঘরেই তুই থাক্ না কেন, আমার কাছেই কিন্তু থাকা বুঝিছিস্?

কাকা আনন্দের সাথে জানালেন– আজ্ঞে ।

তোর যা কিছু দরকার, তোর যা কিছুর প্রয়োজন, সবই কিন্তু তুই আমার কাছে কবি । আর এখান থেকে তুই কিন্তু কোন এ্যালাউন্স নিবি না । কেউ জোর করে দিলি পরেও নিবি না । তোক্ যদি কেউ ভালোবাসে কখনও কিছু দেয়, সে অন্য কথা । তুই কিন্তু কারো কাছ থ্যাকেই কোন প্রয়োজনেই কিছু চ্যাবের পারবি না । সবই তুই আমার কাছে আমাক্ কবি । ক্যারে পারবিনি তো? আমাক্ কতে পারবিনি তো । কি কোস্ আমাক্ সব কবি তো?

ঠাকুরের তিনবারের জিজ্ঞাসাতেই আমার কাকা তিন সত্যির মতোই তিনবারই কিন্তু 'আঁজ্ঞে হ্যাঁ' বলেছিলেন ঠাকুরের সামনেই ।

ঠাকুর খুব মিষ্টি হেসে কাকাকে বললেন,–তুই তো বি.এস.সি. পাশ করিছিস্?

কাকা বললেন– আঁজ্ঞে হ্যাঁ ।

তুই বি.এ. পাশ করবের পারিস্ না?

আঁজ্ঞে আপনি বললেই পারি ।

তা করলিই হয় ।

আমার কাকা মাথা মুন্ডন করে শিখা রেখেই বাগুইআটির বাড়ীতে এসেই আমার ঠাকুরদা ঠাকুমা বাবাকে প্রণাম করে জানিয়ে দিয়েছেন, নরেন্দ্রপুর রামকৃষ্ণ মিশনের চাকরিটা ছেড়ে দিয়েছেন । জানিয়েছন, বাকি জীবনটা কাকা আশ্রমে ঠাকুরের কাছে তাঁর কাজ করে কাটাবেন ।

আমার বাবা শুধু জিজ্ঞাসা করেছিলেন,–ক্যারে তোর ভগবান তুই পাইছস্?

আমার বাবার পা দু'খানা জড়িয়ে ধরেই কাকা বলেছিলেন,–বড়দা, ভগবান কি বলিস্! ঠাকুর স্বয়ং পুরুষোত্তম!

বাবা বললেন–বুঝলিই ভালো । টিকে থাকিস্ । তারপর থেকে আশ্রমেই থাকেন কাকা ।

কাকা সে সময়ে ঠাকুরের আদেশেই বি.এ. পাশ করার প্রস্তুতি নিচ্ছেন । দু'বেলা কাকার জন্য শুধু আনন্দবাজারের ব্যবস্থাই করেছেন । ব্যস্ ঐ পর্য্যন্তই । জামাকাপড় আর শরীরে ক্রমান্বয়েই জমে উঠেছে নোংরা আর ময়লা । কাকা যেন নোংরা আর ময়লারই এক চলমান মানচিত্র । ঠাকুর বাড়িতে কাকার সঙ্গে দেখা হলে সামান্য কিছু মামুলী কথাবার্ত্তা হয় । আমরা কাকার ঐরকম চেহারার দশা দেখে বেশী কিছু জিজ্ঞাসা করে ফেলি ভেবেই হয়তো ব্যস্ততার অজুহাতে কাকা তাড়াতাড়ি অন্যত্র চলে যান আমাদের সামনে থেকে । এমনি করেই কিন্তু আমাদের দিনগুলো চলছিল । কাকার জন্য কেমন একটা মানসিক চাপ নিয়েই ।

একদিন হঠাৎ সকালে বাবাকে দেখেই কেমন সকলেই চমকে গেলাম ।

আমাদের অবাক হওয়ার আরও কারণ ছিল, বাবার উৎকণ্ঠিত জিজ্ঞাসাতেই । বাবা জিজ্ঞাসা করলেন,–কি খবর কি? হঠাৎ কাল বিকালে ঠাকুর ফোন করায়ে আমাক্ সকালেই আসবের কলেন । কি হইছে কি? সব ভালো তো?

বাবার কথা শুনে আমরা সকলেই হতবাক । কারণ গতকাল আমরা সকলেই ঠাকুর ভোগের পরে তামাক সেবনের ও শয়ানের পূর্ব মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত ওখানেই ছিলাম । কই আমাদের কাউকেই তো তিনি কিছুই বলেননি । জানাননি । জানতেও তো পারিনি তেমন কিছুই । কাকার সঙ্গেও তো সন্ধ্যায় রাতে দেখা হল । কাকাও তো বললেন না কিছুই ।

বাবা কেমন অস্থির হয়ে উঠছেন । ব্যস্তভাবেই বললেন,-তাড়াতাড়ি আগে ঠাকুরের কাছ থেকে ঘুরে আসি । বাবার ভিতরে যেন কেমন উপচে পড়া চাঞ্চল্য লক্ষ্য করা গেল । বার বার বলতে লাগলেন আপন মনেই,–এত জরুরী ডাকক্যান! কি হলো কী! ঠাকুরের জন্য যেমন বরাবর কিছু না কিছু আনেন তেমনই একটা ব্যাগ । তার সাথেই বাবার হাতে আরও একটা বড় প্যাকেট । বাবার চিন্তিত চাপা অস্বস্তির সাথেই সকলেই রওনা হলাম ঠাকুর– প্রণামের জন্য ।

ঠাকুর–প্রণাম করে মাথা তুলতেই বাবা কোন কিছু বলার আগে ঠাকুর বাবাকে বললেন তাড়াতাড়ি য্যায়েই আগে ভাইয়ের সাথে দেখা করে আয় গা তোর ভাই হয়তো তোক্ কিছু কবিনি ।

ঠাকুরের কথামতোই বাবা আর কোনও কথা না বলেই কাকার ঘরের দিকে রওনা হলেন । আমরা সকলে ঠাকুরের কাছেই বসে থাকলাম । আমার বাবার রওনা হয়ে যাওয়া পথের দিকে

তাকিয়ে ঠাকুরের ঠোঁটের ভির থেকে চাপ ঠেলে যেন সামান্য মুচকি এক ইঙ্গিতবহুল হাসি কেমন চুঁইয়ে এল।

ঠাকুর বললেন–তামাক দিবি নাকি?

বেশ অনেকক্ষণ সময় পার হয়ে গেল। ঘরের ভিতরে ঠাকুর সকলের সঙ্গে যেমন রোজকার মতো আলাপ-আলোচনা কথ াবার্তা বলেন, তেমনি কথাবার্তার মধ্যেই হঠাৎ সামনের দিকে তাকিয়ে উল্লসিত আনন্দে উৎফুল্লি হিল্লোলের ভাবাবেগে হেসে বেশ জোরে বলতে লাগলেন শরীর দুলিয়েই–শালা মানাইছে কি সুন্দর! খুব মানাইছে!

ঠাকুরের দিকে মুখ করে বসে থাকা সকলে তখন পিছনের দিকে তাকাতেই দেখা গেল, আমার বাবা আর কাকা দুজনেই একসাথে আসছেন। দুজনে একসাথে ঠাকুর-প্রণাম করার সাথে সাথেই, ঠাকুর বেশ দুলে দুলে হাসতে হাসতে নাটকীয় ভঙ্গিমা করে বলতে লাগলেন–আহা-হা! শালা, এমন একখান্ বদ্দাদা যদি আমার কপালে জুটত! বারবারই এই একই কথা তিনি বলে চললেন। বারবার দেখছেন। হাসছেন। একই কথা বলে চলেছেন।

আমার কাকার সুন্দর ফর্সা ধবধবে টকটকে রঙের মুখখানা আবার যেন ফিরে এসেছে। কাকার নতুন ধুতি পাঞ্জাবী। কি সুন্দর দেখাচ্ছে আমার কাকাকে। কাকা কেমন যেন লজ্জা বিহ্বলিত সংকোচে। একবার ঠাকুরের দিকে, একবার আমাদের দিকে, একবার বাবার দিকে, তারপরে মাটিতে মাথা নিচু করে তাকিয়ে থাকলেন। আমরা লক্ষ্য করলাম বাবার হাতে সেই প্যাকেটটাই নেই।

বাবা এবার সোজা ঠাকুরকে জিজ্ঞাসা করলেন–এবারে কন্ তো আমাক্ ডাকিছেন ক্যা?

ঠাকুর হাসলেন। চোখদুটো কোন এক ইশারায় যেন দোলালেন। ভুরু নাচালেন। বেশ শরীর দোলালেন। তারপর বললেন–ক্যা, তোর ভাই তোক্ কিছু কয় নাই?

হ্যাঁ। সে তো ভাই ভাইয়ের প্রয়োজনের কথা বলিছে।

তাই নাকি!

তা কী প্রয়োজন তোর ভাইয়ের?

এই তো ইষ্টভৃতি স্বস্ত্যয়নী, দাড়ি গোঁফ চুলকাটা, জামাকাপড় কাচার সবান, এইসব টুকিটাকি প্রয়োজনের কথা কচ্ছিল। তা আমি কলাম, মাসে তোর ঠিক কত হলি পর ভালভাবে চলে আমাক্ ক। তা ভাই কল যে মাসে তিরিশ টাকা হলি পরে ওর সব ভালোমতো চলবের পারে। তা আমি ওর তিন মাসের টাকা উয়ের কাছে দিয়ে গেলাম। বাড়ীত্ য্যায়েই আবার পাঠাবো নে।

শ্রদ্ধেয় প্যারীদা সঙ্গে সঙ্গে ঠাকুরের সামনে এসে বললেন–ঠাকুর সুজিতের জন্য আমি ভেবেছি নব্বুইটা টাকা দেব। এমনি করে হঠাৎ ঠাকুরঘরে দু' একজন করে বেশ অনেকেই বলে উঠলেন–ঠাকুর আমরাও মাসে মাসে সুজিতদাকে কিছু কিছু দেব।

আমার বাবা আর কাকা তো অবাক। কাকা অবাক হয়ে সকলকেই চেয়ে চেয়ে দেখছেন; আর ঠাকুরের দিকে তাকাচ্ছেন। প্যারীদা ঠাকুরের অনুমতির অপেক্ষাতেই টাকাটা হাতে ধরে আছেন দেবার জন্য। আমার বাবা বললেন–আপনি রাখেন তো প্যারীদা। কোথায় আপনাকেই আমাগরের দেওয়া উচিত। আপনি দিবেন ক্যা? সঙ্গে সঙ্গে ঠাকুর বললেন–প্যারী আমার কাছে থাকে, ও-ই তো দিবের পারে। ও এখানে অনেক পায়। বামুনেক্ শ্রদ্ধাভরে যখন দিচ্ছে, তখন তো নেওয়াই ভাল। তবে,–বলেই ঠাকুর একটু থামলেন। প্যারীদাও আমার কাকার সামনে গিয়ে থেমে গেলেন।

ঠাকুর বললেন–আমার মনে হয় সকলের সবই গব্রারই হাতে দেওয়া ভাল। তোরা যারা যারা কিছু কিছু দিবি কচ্ছিস্ তা সবই কিন্তু ঐ গব্রার কাছেই পাঠাবি। তার থেকে গব্রা যতটুকু যেমন প্রয়োজন মনে করে তাই সে তার ভাইয়ের জন্য পাঠাবিনি।

ঠাকুরের কথা শুনে সকলেই ঠাকুরের সামনেই আমার বাবার পেতে রাখা দুহাতের মুঠোতে কিছু কিছু করে টাকা দিতে লাগলেন। কিছুক্ষণের ভিতেরই এক সময়ে বাবার দুহাতের ভিতরে উপচে উঠল টাকা। আমার বাবার পেতে রাখা দুহাতের মুঠোর ভিতরেই কেমন জমে জমে জমাট বেঁধে বড় হওয়া টাকার ছোট্ট পাহাড়কে।

বাবা এবার ঠাকুরকে বললে–এবারে কন্ তো আপনি হঠাৎ আমাক্ এমন জরুরী ডাক্ দিয়ে ফোন করায়ে ডাকিছিলেন ক্যান্?

ঠাকুর বাবার কথা শুনে মুচকি মুচকি হাসতে লাগলেন। বাবা বললেন–হাসলি হবিনানে। কওয়া লাগবিনি আমাক্ ডাকিছেন ক্যান্।

বাবার এবারের কথায় ঠাকুর বাবার দিকে তাকালেন অত্যন্ত সহজ সাধারণভাবে বললেন–আমি তো ডাকি নাই। তোক্ ডাকিছিল তো তোরই ভাই। কি সুন্দর একখান্ বদ্দাদা রে! যদি আমার কপালে এমন একখান বদ্দাদা জুটতো!

বার কয়েক ধরে একই কথা বলেই ঠাকুর হঠাৎ করে আমার কাকার দিকে তাকালেন। কিছুক্ষণ কাকার চোখের দিকে স্থির দৃষ্টিতে চেয়ে থাকলেন ঠাকুর। কাকা ঠাকুরের মুখের থেকে মাটিতে দৃষ্টি নামালেন।

কাকার দিকে তাকিয়েই ঠাকুর আস্তে আস্তে থেমে থেমে বললেন, তোর প্রয়োজনের কথা তুই শুধু আমাক্ কবি। তুই আমাক্ বললি না ক্যা? তুই আমাক্ ভালোবাসিস্ না? এ্যাঁ! কিরে! তুই আমাক্ ভালোবাসিস্ না?

ঠাকুরঘরটা হঠাৎ করে কেমন যেন নিস্তব্ধ হয়ে গেল। সমস্ত ঘরের ভিতরে ঠাকুরের উচ্চারিত শব্দেরই ধ্বনির প্রতিধ্বনি। সকলের চোখ কেমন সজল হয়ে গেল।

অনুস্মৃতি

ঠাকুরের আন্দোলনটাই হলো সর্বতোমুখীন। সামঞ্জস্য আর সংগতির। এরই সাথে প্রত্যেকটি বিষয়ের কার্য্যকারণ সূত্র সঙ্গতিকে জানা, শোনা, দেখা ও বুঝের পাল্লায় এনে, বোধ করে, তাকে সপরিবেশ ক্রমোন্নতিতে বিবর্দ্ধিত করে তুলে–ইষ্টস্বার্থ প্রতিষ্ঠায় নিবেদন করে, সার্থকতা ও তৃপ্তিকে অনুভব করা। এই আন্দোলনের বাইরে আর কোন আন্দোলন থাকতেই পারে না। কারণ, জীবন ও জগৎকে ঘিরে, আশ্রয় করে, যা' কিছু–তার সবই এই আন্দোলনের ভিতরে আছে যা জীবনকে পরিবেশ সহ সামগ্রিক ভাবে ধরে রাখে। তাই ধর্মে জীবন দীপ্ত রয়। ঠাকুরের ধর্ম তাই-ই। যা সকলের। নিজস্ব বৈশিষ্ট্য সম্মত রকম ও ধরণের। এমনতর জীবনের অধিকার লাভ ও সম্যক্ উপভোগের জন্য তো তেমনতর দক্ষতার প্রয়োজন। যা অনস্বীকার্য্য। দীক্ষাগ্রহণ মানে সেই কৌশল অধিগত করারই অনুশীলন। সবচেয়ে আশ্চর্য্য ও মজার ব্যাপার হলো জীবনে সুখ স্বাচ্ছন্দ্য ভোগের প্রধান উপকরণ হলো প্রবৃত্তি, আবার প্রধান অন্তরায়ও হলো প্রবৃত্তি। প্রবৃত্তি হলো সুখ স্বাচ্ছন্দ্য লাভের অন্তরায় না হয়ে সহায়ক হয় কি করে, তারই কায়দা, তুক ও মরকোচ জানেন আচরণশীল আচার্য্য সদ্গুরু ইষ্টদেব। কোন তত্ত্ব নয়। একটা সম্পূর্ণ পূর্ণাঙ্গ মানুষ। কোন অলৌকিকত্বের ম্যাজিক নয়। সবটাই হাতে কলমে বাস্তবে কেমন ও কি, তার আনুপূর্ব্বিক কর্মের দ্বারা, অনুভূতির মধ্যেই জানা। আর সেই জানাটা, এমন স্বতঃ-আগম প্রকৃতির, যেন জানাটারই হয়ে থাকা রূপ তিনি। সব সমস্যার ঠোক্কর, শুভ মীমাংসায়, হৃদ্য সমাধানে পরিবেশন করে তুলে ধরেন। দীক্ষার বিধি অনুযায়ী অনুশীলনে, ইষ্টের প্রতি অন্তরাস জন্মে। সেই অন্তরাস থেকেই, অর্থাৎ ইষ্টকে বাস্তব জীবনে পরিপূরণ করার আগ্রহ থেকেই আসে কর্মমুখরতা। সেই খানেই প্রবৃত্তিগুলো আর অন্তরায় না হয়ে উপভোগ হয়। ঠিক তখনই তা পরিবেশের প্রতি প্রীতিমুগ্ধতা আনে। সেইখানেই আসে ব্যক্তির বিন্যাস। ব্যক্তি নির্মাণ।

এই নির্মাণ যজ্ঞের আয়োজন ঠাকুর তাঁর আশ্রমে করেছিলেন। মানুষের তথাকথিত চলে আসা ধর্ম বোধ, ধর্ম পালন, দীক্ষা গ্রহণ, সাধনা-তপস্যা করার যে ধ্যান ধারণা, তারই আলোকে তো ঠাকুরের আশ্রম ও সামগ্রিক কাজকর্ম বিবেচিত হবে। ফলে মানুষ অবাক হয়। বিস্মিত হয়। কারণ, দীক্ষা গ্রহণ করে, ধর্ম পালন করতে আশ্রমে এসে আবার এত রকমারি সর্বতোমুখী কর্মের প্রতিষ্ঠানিক ব্যবস্থা ও আয়োজন কেন!

দৃষ্টি আকর্ষণ

সন্দীপনার চলার পথকে সাবলীল করার জন্য আপনার বকেয়া চাঁদা পরিশোধ করুন। সেই সাথে ব্যক্তিগত ও প্রাতিষ্ঠানিক বিজ্ঞাপন দিয়ে সন্দীপনার কলেবর বৃদ্ধিতে সহায়তা করুন।

সৎসঙ্গ সংবাদ প্রেরণকারী/ লেখকবৃন্দের প্রতি সবিনয় অনুরোধ-পরিচ্ছন্ন কাগজের একপাশে স্পষ্টাক্ষরে লেখা হওয়া বাঞ্ছনীয়।

-সম্পাদক

আমি তোমাকে ভালবাসি

জগদীশ দেবনাথ

(পাঁচ)

প্রিয়পরম বা ঠাকুরকে ভালবাসতে হয় জীবন বা সত্তার সবটুকু দিয়ে। তাঁকে বা তাঁর বলাগুলিকে জীবনে বা চরিত্রে অবিকল ধারণ করাই ভালবাসার লক্ষণ। যুক্তির জালে ফেলে কোন মানুষকে সাময়িকভাবে পরাভূত করা গেলেও তার মন জয় করতে হলে চাই নিখাদ ভালবাসা। পাবনার হিমাইতপুরে, পরে বিহারের দেওঘরে ঠাকুরের কাছে এসে মানুষ তাঁর সঙ্গসুধা ছেড়ে যেতে চাইতো না। আলোচনার মৌতাতে মশগুল হয়ে পড়ত। একজন হয়ত ঠাকুরের কাছে এসেছে তার দুঃখ, ব্যথার কথা জানাতে বা কোন রোগ-নিদান পেতে। তার সামনে চলমান আলোচনায় নিজের সমস্যারই সমাধান-সূত্র পেয়ে গেল। সমস্যার কথা জানানোর প্রয়োজনই পড়লো না। ঠাকুর ছিলেন একজন মন-পাঠক (Mind reader)। মানুষকে সমস্ত সত্তা দিয়ে ভালবাসতেন বলেই তাঁর কাছে দুঃখ ব্যথার কথা নিবেদনের প্রয়োজন পড়তো না। ঠাকুরের চাক্ষুষ উপস্থিতি এখন নেই কিন্তু তিনি ভালবাসার জীবন্ত আধার। এই আধার বা উৎসের সাথে যার যত সু-সংযোগ, তিনি তত মানুষের আকর্ষণীয় বস্তুতে পরিণত হন। সে কারণে ঠাকুরকে নিজ চরিত্র-বৈশিষ্ট্যে ধারণক্ষম ভক্ত, যাজক বা ঋত্বিকের সাহচর্যেও মানুষ ইষ্টানুরঞ্জিত হয়। ভক্ত-কথায় ইষ্ট ভাবনা স্ফুরিত, মূর্ত হয়ে উঠে। চরিত্র বা আচরণে ইষ্টানুগত্য না থাকলে শুধু মুখের কথায় ঠাকুরকে অন্যের কাছে সঠিকভাবে সঞ্চারিত করা যায় না। সেজন্য আচরণশীল মানুষই প্রকৃত ধার্মিক বা যাজক। এমন ভক্ত বা যাজকের ইষ্টকথায় মানুষ ভালবাসার ছোঁয়া পায়, উৎস সন্ধানে ব্রতী হয়। নিজেকে ইষ্টকাজে সদা-সম্পৃক্ত করতে স্বতঃই উৎসাহী হয়ে উঠে। তাই, নিজে যথার্থ যজনশীল না হয়ে লাখ বক্তৃতা বা যাজনে তেমন কাজ হয় না।

যে দুজন মানুষ শ্রীশ্রীঠাকুরকে প্রথম গুরুপদে বরণ করেছিলেন তাদের একজন কিশোরীমোহন দাস, বয়সে ঠাকুরের চেয়ে ৭/৮ বছরের বড় (জন্ম ১৪ চৈত্র ১২৮৭ বঙ্গাব্দ)। অন্যজন ঠাকুরের কৈশোরকালের খেলার সাথী অনন্তনাথ রায়। তিনিও ঠাকুরের চেয়ে বছর দুয়েকের বড় ছিলেন (জন্ম ৬ আশ্বিন, ১২৯৩ বঙ্গাব্দ)। কীর্তন যুগের এই দুই স্থিতধী সাধক ভক্তের ইষ্টনিষ্ঠার কথা সুবিদিত। পরে এই দুই পুরুষোত্তম-পার্ষদের সাথে যুক্ত হন আচার্য সতীশচন্দ্র গোস্বামী। এই তিনজনকে কীর্তন যুগের ত্রয়ী পুরুষ বলে অভিহিত করা হয়। "কীর্তনের ঋষি" খ্যাত কিশোরীমোহনের ভক্তি, ভালবাসা ও ইষ্টনিষ্ঠার অমৃতকথার কিছু অংশ প্রাসঙ্গিক বলে উল্লেখ করছি। "ঠাকুরের প্রতি তাঁর (কিশোরীমোহনের) দুর্বার ভালবাসা পরিব্যপ্ত হয়ে পড়েছিল বিশ্বময়। সকলেই যে পরমপিতার সন্তান এবং সবার মধ্যেই যে তিনি বিদ্যমান, কিশোরীমোহনের অন্তর্লোকে এই বোধের উন্মেষ হয় অতি সহজে, স্বাভাবিকভাবে। সবাইকে ভাল না বেসে তাই তাঁর উপায় ছিল না। অপরের সুখ-দুঃখ, আনন্দ-বেদনায় তাঁর ছিল একাত্মতার অনুভব। জীবনের চরম সত্য বলে যাঁকে জেনেছেন, যাঁকে গ্রহণ করলে সব সমস্যার সমাধানের পথ পাওয়া যায়, সেই ঠাকুরের কথাই বলে যেতেন অবিরত বিভিন্নভাবে– প্রেমের ফল্গুধারা চিরপ্রবহমান ছিল তাঁর অন্তরে। মানুষকে তাই তাঁর প্রিয়পরম ঠাকুরের সাথে যুক্ত করার মধ্যেই ছিল চরম তৃপ্তি।"১

অন্যের বাঁচা-বাড়াকে নিজের বাঁচা-বাড়ার সমতুল জ্ঞানে তিনি মানুষের সেবা করতেন। সে কারণে দেখা যায় ১৩৫০ বঙ্গাব্দের দুর্ভিক্ষে হিমাইতপুর ও তার আশপাশের অন্ততঃ ৫০টি গ্রামের একটি লোকও অনাহারে প্রাণ হারায়নি। ঠাকুরের নির্দেশে কিশোরীদার ব্যবস্থাপনায় সূর্যোদয়ের আগ থেকে মধ্যরাত পর্যন্ত ভিক্ষা ও দান গ্রহণ চলত। অভূক্ত মানুষের একজনও খাবার না খেতে পারলে তিনি সেদিন অন্নগ্রহণ করতেন না। সত্তারূপে ঠাকুর সকলের মাঝেই রয়েছেন– এই বোধ তাঁকে সর্বদা সজাগ রাখত। ক্ষুধায় একজন কষ্ট পেলে অলক্ষ্যে ঠাকুরই কষ্ট পাচ্ছেন– এমন বিবেচনা থেকে নিজেকে উজার করে কাজ করে যাচ্ছিলেন। দুর্ভিক্ষের সময় চাল সংগ্রহ করতে গিয়ে একদিন তিনি ঝড়-জলে ভিজে যান। কেউ একজন সাথে ছাতা না রাখার কারণ জানতে চাইলে তিনি সহজভাবে উত্তর দেন এই বলে যে– "তা কী করে নেব, ঠাকুর তো ছাতা নেওয়ার কথা বলেননি।" ২ ইষ্টানুগত্য ও ইষ্টনির্ভরতার এমন বিরল দৃষ্টান্ত সবার জন্য শিক্ষণীয় বিষয় বৈকি।

১৩৪১ বঙ্গাব্দে অনন্তনাথ রায় বাইরে থেকে বসন্ত রোগাক্রান্ত হয়ে আশ্রমে ফেরেন এবং এই রোগেই তিনি মৃত্যুবরণ করেন। সে সময় এই মরণ ব্যাধিতে কিশোরীমোহনও আক্রান্ত হন। এক পর্যায়ে তাঁর অবস্থা সংকটজনক পর্যায়ে পৌঁছলে ডাক্তারগণ হতাশ হয়ে প্রাণের আশা ছেড়ে দেন। এমন অন্তিম অবস্থায় শ্রীশ্রীঠাকুর কিশোরীদার ঘরের দরজায় দাঁড়িয়ে উচ্চকণ্ঠে ডেকে উঠেন– "ডাক্তার, আমাকে ছেড়ে যাও কোথায়? তোমরা সবাই চলে গেলে আমার কী উপায়? উঠ শিগ্‌গির।"৩ ঠাকুরের এই কথাতেই চোখ মেলে তাকালেন এবং তাঁর দেহে ধীরে-ধীরে প্রাণ-প্রবাহের সজীবতা ফিরে এল। কিছুদিনের মধ্যেই তিনি সুস্থ হয়ে আবারো পুরোদমে

ইষ্টকাজে ফিরে গেলেন। এরপর আরও প্রায় দশ বছর শ্রীশ্রীঠাকুরের কাজে ব্যাপৃত থেকে ১৩৫১ বঙ্গাব্দের ১৯ বৈশাখ ৬৩ বছর বয়সে ঠাকুরের আদরের 'ডাক্তার' পরপারে সাধনোচিত দিব্যধামে পাড়ি জমান।

শ্রীশ্রীঠাকুর কিশোরীমোহনদার প্রসঙ্গে একবার বলেন– "আমি ছিলাম একা, কেউ চিনতো না, জানত না। তবে আমিও ভালবাসতাম লোককে, লোকেও ভালবাসত আমাকে। কিশোরীকে পেলাম। তাকে লোকে পয়লা নম্বর গুণ্ডা বলে জানত। কিন্তু আমি দেখলাম ওর একটু ক্ষুধা আছে। ওকে গান বেঁধে দিতাম, ঠাকুর হরনাথের কথা বলতাম। খুব ভক্তি হল তাঁর প্রতি। সেই ভক্তি ক্রমে ক্রমে দানা বেঁধে উঠলো আমাকে নিয়ে, ও আমাকেই চেপে ধরলো।"৪ এখানে প্রণিধানযোগ্য ব্যাপার হচ্ছে, শ্রীশ্রীঠাকুর কিশোরীদাকে ঠাকুর হরনাথের কাছে দীক্ষাগ্রহণের জন্য পাঠিয়েছিলেন। হরনাথ ঠাকুর কিশোরীদাকে বুঝিয়ে ফেরত পাঠিয়েছিলেন এই বলে– "যিনি যুক্তি পরামর্শ দিয়ে তোমাকে এখানে পাঠিয়েছেন, তিনিই তোমার গুরু। তিনি সদগুরু, যুগপুরুষোত্তম। তাঁর সংঘ গড়ার সময় হয়েছে। তুমি সর্বমনপ্রাণ দিয়ে তাঁরই অনুসরণ কর। তোমার পরম মঙ্গল হবে। আমিও তো তাতেই আছি।"৫ ঠাকুর হরনাথের বলার পরও কিশোরীমোহনের ঠিক বিশ্বাস হচ্ছিল না। বিশেষত অনুকূলচন্দ্র তাঁর খেলা বা কীর্তনের সাথি, বয়সে ছোট, তাঁকে কিভাবে গুরুপদে বরণ করা যায়? আবার হরনাথ ঠাকুরের কথাই বা অবজ্ঞা করবেন কিভাবে? সদগুরু মাত্রই সর্বজ্ঞ হন। তাই, কিশোরীমোহন অনুকূলচন্দ্রকে পরীক্ষার মানসে অমাবস্যার রাতে নির্জন শ্মশানে বসে ভগবানকে ডাকতে লাগলেন– "দয়াল কোথায় তুমি, একটিবার দেখা দাও, অভাগার তাপিত প্রাণ শীতল কর।"৬ ঠিক তখনি 'ডাক্তার, ডাক্তার' শব্দ কিশোরীদার শ্রুতিগোচর হলে ভূত ভেবে রাম নাম জপতে লাগলেন। কারণ এই গভীর রাতে শ্মশানে কোন মানুষের আসার কথা নয়। ভয়ে কাতর কিশোরীমোহন দ্বিতীয়বার শুনতে পেলেন– "রাম নাম করছ কেন? আমি ভূত নই, আমি অনুকূল।"৭ আরও নানা কথাবার্তার পর ঠাকুর তাঁকে শ্মশান থেকে বাড়ি নিয়ে চললেন। কিশোরীমোহনের সন্দেহ তবু যায় না। মনে মনে ভাবতে লাগলেন ভূত-প্রেতের তো পা মাটিতে পড়ে না। তাই সহযাত্রীর পা মাটিতে পড়ছে কি না বিশেষভাবে লক্ষ্য করছেন। সাথে সাথেই ঠাকুর বলে উঠলেন–"ডাক্তার পা ঠিকই মাটিতে পড়ছে, আমি ভূত নই, নির্ভয়ে চল।"৮ এরপরও তাঁর সন্দেহবাতিক মনের দ্বন্দ্ব গেল না। ভাবলেন, এখন যদি তিনি (ঠাকুর) পদ্মায় ডুব দিয়ে আসেন তবেই মনে কোন সংশয় থাকবে না। তাঁর ভাবার সাথে সাথেই ঠাকুর বলে উঠলেন– "ডাক্তার দাঁড়াও, জুতোয় গু লেগেছে মনে হচ্ছে, পদ্মায় একটা ডুব দিয়ে আসি।"৯ তিনি জামাকাপড় নিয়েই পদ্মায় ডুব দিয়ে ফিরলেন। এরপরও কিশোরীদার মনে হলো সত্যি-সত্যি গু মাড়িয়েছে বলেই পদ্মায় ডুব দিয়ে স্নান করেছেন। এখন আবার স্নান করলেই নিঃসন্দেহ হব। ঠাকুর বাড়ি পৌঁছে স্নানঘাটের দিকে যেতে-যেতে বললেন– "ডাক্তার দেহের ময়লা ধুলেই যায়, মনের ময়লা কিন্তু সহজে দূর হয় না। তাহলে আর একবার স্নান করে আসি, কি বল?"১০ এই বলে তিনি পুনরায় জলে নেমে স্নান করে আসলেন। অতঃপর একদিন আবারো ঠাকুর অন্তর্যামী কি না এই সন্দেহ নিরসনের জন্য তিনি ভিন্ন পরীক্ষার মাধ্যমে বাস্তব প্রমাণ পেতে চাইলেন। দুটো পাত্রে ভোগ সাজিয়ে একটি হরনাথ ঠাকুরের নামে অন্যটি ঠাকুর অনুকূলচন্দ্রের নামে নিবেদন করে ভাবতে লাগলেন– ঠাকুর যদি তার উদ্দেশ্যে নিবেদিত ভোগ গ্রহণ করেন, তবেই সন্দেহের অবসান হবে। ভোগ নিবেদনের বেশ পরে ঠাকুর তার কীর্তনের সঙ্গী দুর্গানাথ স্যান্যালকে সাথে নিয়ে কিশোরীদার বাড়িতে হাজির হলেন। আর, সজ্জিত দুটি ভোগই নিজের কাছে টেনে নিলেন এবং বললেন– 'দুই কি আছে ডাক্তার, সবই এক'। এই বলে একটি ভোগ দুর্গানাথ স্যান্যালকে দিয়ে তাঁর জন্য কিশোরীদার পূর্ব নির্ধারিত পাত্রের ভোগই খেতে লাগলেন। এরপরও সংশয়ের নিরাকরণ হলো না। কীর্তনের চরম অবস্থায় ঠাকুর ভাব সমাধিস্থ হয়ে বাহ্য-চেতনাহীন অসাড় দেহে পড়ে যেতেন। ঐ অবস্থায় তাঁর শ্রীমুখ থেকে নেমে আসত দিব্যভাবানুরঞ্জিত বাণী। এই বাণী সংকলনই পরে "পুণ্যপুঁথি" নামে মূদ্রিত হয়েছে। যা-হোক, ভাব সমাধিস্থ অবস্থায় ঠাকুরের দেহে কোন বাহ্য-চেতনা আছে কি না তা পরীক্ষার জন্য একবার কিশোরীদা একটি জলন্ত টিকে শ্রীশ্রীঠাকুরের উরুতে চেপে ধরেন। ঠাকুরের অচৈতন্য দেহ যেমন ছিল তেমনই পড়ে রইল। দগ্ধস্থানে ব্যথার কোন বিকার দেখা গেল না। সমাধি ভঙ্গের পর ব্যথার চেতনা ফিরে এল। কিশোরীদার অন্তর কৃতকর্মের জন্য গভীর অনুশোচনায় দীর্ণ-বিদীর্ণ, ক্ষত-বিক্ষত হল। এভাবেই তাঁর সকল সন্দেহের নিরসন হয় এবং জননী মনোমোহিনী দেবী তাঁকে সৎমন্ত্রে দীক্ষা দান করেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর কিশোরীদার শ্রাদ্ধতর্পণ উপলক্ষ্যে যে মর্মস্পর্শী, ইষ্টসঞ্চারী অভিভাষণ প্রদান করেন তা স্বয়ং ভগবানের ভক্ত-চরিত্রের স্বরূপ উদঘাটনের শাশ্বত দলিল হিসাবে চিরদিন ভক্তজনের চলার পাথেয় হয়ে থাকবে। সেটি হচ্ছে–

"সাধু ঋদ্ধি তাপস!

ভক্তবীর কিশোরীমোহন আজ আর নাই। ইষ্টানুগ সেবা-সম্বর্ধনী হোমবেদীর কল্যাণ যজ্ঞানলে তার ঐহিক শরীর আহুতি দিয়া নিজেকে জ্যোতিষ্মান অমরার অমর স্পর্শে সার্থক করে তুলেছে। আমার আবাল্য সহচর যৌবনের জ্যোতি, প্রৌঢ়ের পরম-বান্ধব তার যা কিছুকে সম্বর্ধিত করে যথাযোগ্য লোকে চলিয়া গিয়াছে। আজ আর সে নাই। আমি একা, সম্মুখে তার শ্রাদ্ধ-বাসর, আমাদের প্রাণঢালা অর্ঘ্য নিয়ে তাকে অভিনন্দিত করার দিন সম্মুখে। ভক্তবীর, সেবাভিক্ষু, পরমসন্ন্যাসী তার আত্মাকে আমাদের প্রাণকাড়া সশ্রদ্ধ সামর্থ দিয়ে ধন্য হতে কেউ কি কুণ্ঠিত হব? তার সেবাকে স্মরণ করে প্রাণঢ়ালা কৃতজ্ঞতায় তার স্মৃতিকে পূজা করতে কোন কুণ্ঠা আমাদিগকে নিরোধ করতে পারে? কৃতজ্ঞতা আমাদিগকে দীপ্ত করে তুলুক। আরও দেখতে হবে আমাদিগকে তার পরিবারবর্গের কেউ যেন কখনো অন্ন-বস্ত্রের অনটনে বিমর্ষ না হয়ে উঠে। ধৃতি, ঋদ্ধি ও প্রজ্ঞা বুকের প্রাণকাড়া ভালবাসা নিয়ে ভক্ত কিশোরীমোহনের জয়গান করুক।

২৫ বৈশাখ
সন ১৩৫১
তোমাদেরই দীন 'আমি' "১১

ভক্ত বা সাধক চরিত্রের পঠন-পাঠন, অনুধ্যান ব্যক্তিজীবনকে ইষ্টকেন্দ্রিক ভাবধারায় প্রভাবিত করে। কিশোরীদার ইষ্টপ্রাণতা, ঠাকুর-অনুধ্যান আমাদের চিরকালীন শিক্ষার বিষয়। ব্যক্তিজীবন সর্বার্থে ইষ্টনন্দিত না হলে ঠাকুরকে উপলব্ধি করা দুষ্কর। সুখে কিংবা দুঃখে, যে অবস্থায়ই থাকি, সবই যে তাঁর দয়ার দান, সেই বোধ কাজ করে না। সুখে, শান্তিতে থাকলে তো ভালোই, বিপরীত কিছু হলেই মন বিগড়ে যায়। মন বিগড়ে গেলে বোঝা যাবে ঠাকুর অনুধ্যান সঠিক হচ্ছে না। সুখে কিংবা দুঃখে নিরপেক্ষ হয়ে অবিচল নিষ্ঠায় তাঁকে ভালবেসে যেতে হয়। তাঁর কাজ বা ব্রত পালন করতে হয় যথানিয়মে। ভালবাসার এইরকম জেল্লায় পড়ে দোষ-দুর্বলতা, দুঃখ-বিষাদ সব ধুয়ে-মুছে যায়। বৃত্তি-প্রবৃত্তির বাঁধন মুক্ত হয়ে নিজেকে ইষ্টপথের যোগ্য করে তুলতে হয়। আর এই রকম বৃত্তিভেদী প্রগাঢ় টানই মানুষকে ইষ্টগৌরবগাথায় বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত করে।

১৪২৩ বঙ্গাব্দের দোল-উৎসব হল এই ফাল্গুন মাসে। হাজার হাজার ভক্ত হিমাইতপুর মন্দির প্রাঙ্গণে সমবেত হয়ে দুই-তিনদিন ইষ্টকথা শুনেছেন। তাঁদের মাথার উপর ত্রিপল আর নীচে ঘাসের উপর বাঁশের চাটাইয়ের যোগান মাত্র ছিল। আমরা জানি ইষ্টকাজে সদাযোগানদাতা অর্ঘ্যনীয় এসব ভক্তের নিজস্ব রকমের আরাম-আয়েশ-পূর্ণ জীবনযাত্রা বিদ্যমান। সেসব তুচ্ছ করে কিসের নেশায়, কার টানে তাঁরা হিমাইতপুরে ছুটে আসেন? এর উত্তর একটাই– শ্রীশ্রীঠাকুর ও তাঁর প্রতি অটুট-অচ্ছেদ্য ভালবাসা। এই ভালবাসাই বৃত্তিভেদী। সকল বৃত্তি-প্রবৃত্তির বাঁধা ছিন্ন করে দোল-উৎসবে মানুষ তার প্রিয়পরমের সান্নিধ্য লাভের আশায় ছুটে আসেন। এখানে এসে নানা প্রতিকূলতার মাঝেও তীর্থপতি ঠাকুরের আশীষধন্য হয়ে ইষ্টচেতনার ক্রমসঞ্চারি "নিষ্ঠাদ্যুতির দ্যোতন আলোয়" উদ্দীপ্ত, উজ্জীবিত হয়। নিষ্ঠানন্দিত মঙ্গলালোকে ভক্তি-অর্ঘ্য সম্বল করে নিজ ঘরে ফিরে যায়। বিদায় নেওয়ার আগে আবারও ফিরে আসার প্রতিশ্রুতিতে অশ্রুপাত করে প্রিয়পরমের সামনে। তাদের অন্তরের ভাষা যেন পুরুষোত্তম-প্রশস্তি হয়ে ঠাকুরের ভাষায় গেয়ে উঠে–

"আলিঙ্গন আর গ্রহণরাগের
বিশ্বলীলার সমাহার,
পুরুষোত্তম তাহার প্রতীক–
দোল-পার্বণই প্রতীক যার;
বিশ্বজনার অন্তর বোধ
ভক্তি-দোলন লক্ষ্য করে
বস্তু হতে বস্তু-অন্তরে
বিশ্বব্যাপ্তি যাতে ধরে।" –শ্রীশ্রীঠাকুর ১২

"বসন্তেরই আবাহনে
ঐ পড়ে বাসন্তী শাড়ি
দুলে-দুলে উচ্ছলতায়
ঘুরছে কত সারি-সারি;
নিষ্ঠাদ্যুতির দোতন আলো
ঢুকলো রে সব অন্তরে,
আনন্দেরই রসাল লীলা
ঢুকলো হৃদয়-কন্দরে;
স্বাদন-ক্রিয়ায় হিয়া নাচনে
উচ্ছ্বসিত ফোয়ারা রসের,
ইষ্টযোগের নিষ্ঠা নিয়ে
পান করে সব হওনা ঢের।"–শ্রীশ্রীঠাকুর ১৩

তথ্যসূত্র– ক। ১, ২, ৩, ৪, ৫ ও ১১ 'ভক্তবলয়'– শ্রীফণিভূষণ রায় ও ড. শ্রীমতী শিখা রায় কৃত।
খ। ৬, ৭, ৮, ৯ ও ১০ 'শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্র'– শ্রীব্রজগোপাল দত্তরায়কৃত।
গ। ১২ ও ১৩ দীপরক্ষী ৩য় খণ্ড, তারিখ ১৫-৩-৫৭ খ্রি.।

স্বামী বিবেকানন্দের যোগ্যা শিষ্যা নিবেদিতা

ড. প্রজ্ঞারঞ্জন দত্ত

সিদ্ধতপস্বী কপিলের তপোভূমি এই বাংলা, শক্তিসাধনার পীঠভূমি দনুজদলনী উপাসনার ক্ষেত্র বাংলা, বীর প্রতাপাদিত্যের বাংলা, শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের বাংলা, রবীন্দ্রনাথ–সুভাষচন্দ্রের বাংলা, শ্রীঅরবিন্দ ও বিদ্রোহী কবি নজরুলের বাংলা, আচার্য জগদীশচন্দ্র ও স্বামী প্রণবানন্দজীর ঐতিহ্যবাহী বাংলা। স্বাধীনতা আন্দোলনের পুরোধা এই বাংলা। বাংলার রাজমুকুট (crown)যে উন্নত বৈশিষ্ট্য ও উদাত্ত মনুষ্যত্বের যথোচিত বিকাশ না ঘটলে সবকিছুই বালুর চরে শুকিয়ে যাবে। বাংলা যদি চিরভাস্বর ও সজীব থাকে, তবে সে মরুভূমিতেও প্লাবন নিয়ে আসতে পারবে। বাংলা জাগলে ভারত জাগবে। বাংলা হ'ল বিশ্বের সামগ্রিক অভ্যুদয়ের চাবিকাঠি। এই ভাবধারাকে পাথেয় করেই স্বামী বিবেকানন্দ ও লোকমাতা নিবেদিতার পথ-চলা স্বাধীনতা বলতে আমরা বুঝি,–'সত্তার অধীনতা' 'সু' বা মঙ্গলের অধিকারী হওয়া। অস্তিত্বের ধারক বাহক যিনি, তাঁকে নিয়ে চলা।

যোগ-সাধনা– মঙ্গলময়ের সঙ্গে বা কোনও কিছুর সঙ্গে যুক্ত হ'ব ব'লে যে প্রচেষ্টা তাইই। তাঁর সঙ্গে আমার নিরন্তর নাড়ীর যোগ, 'হরি ওঁ হরি' অর্থাৎ তিনি আছেন–এই চেতনার পরশ কাঠিতেই এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড উল্লসিত আনন্দময়। 'সাধনা' মানে সেধে নেওয়া। নির্দিষ্ট একটি ঈশ্বরীয় বা কোনও একটি বিশিষ্ট পথে নিবিষ্ট চিত্তে সুদূরপ্রসারী দৃষ্টি নিয়ে একান্তভাবে লেগে থাকাকেই সাধনা বলে। আশির্বাদ মানে অনুশাসনবাদ। তাঁর অনুশাসনে বিধৃত থাকা।

স্বামী বিবেকানন্দের উক্তিগুলো বিশেষভাবে লক্ষ্যণীয়–

(১)

'আদর্শ পুরুষ তিনিই, যিনি গভীরতম নিস্তব্ধতার মধ্যে তীব্র কর্মী এবং প্রবল কর্মশীলতার মধ্যে মরুভূমির নিস্তব্ধতা অনুভব করেন। তিনি সংযম রহস্য বুঝিয়াছেন –আত্মসংযম করিয়াছেন। বাণিজ্য বহুল মহানগরীতে ভ্রমণ করিলেও নিঃস্তব্ধ গুহায় অবস্থিতের ন্যায় তাঁহার মন শান্ত থাকে, অথচ তাহার মন তীব্রভাবে কর্ম করিতেছে। কর্মযোগীর ইহাই আদর্শ। এই অবস্থা লাভ করিতে পারিলেই তুমি কর্মের প্রকৃত রহস্যবিৎ হইলে।

(২)

'সর্বশ্রেষ্ঠ পুরুষগণ শান্ত নীরব ও অপরিচিত তাঁহারা চিন্তার শক্তি কতদূর তাহা জানেন। তাহারা নিশ্চিত জানেন যে, যদি তাঁহারা কোন গুহায় গমন করিয়া গুহার দ্বার বন্ধ করিয়া পাঁচটি বিষয়ে চিন্তা করেন, তাহা হইলে সেই পাঁচটি চিন্তাই অনন্তকাল ধরিয়া থাকিবে। সেই চিন্তাগুলি পর্বত ভেদ করিয়া সমুদ্র পার হইয়া সমুদয় জগৎ ভ্রমণ করিয়া কোন এক মস্তিষ্কে প্রবেশ করিবে এবং এমন লোক উৎপন্ন করিবে, যে ঐ চিন্তাগুলিকে কার্যে পরিণত করিবে।'

(৩)

সমগ্র মানব-জাতির আধ্যাত্মিক রূপান্তর ইহাই ভারতীয় জীবনধারার মূলমন্ত্র, ভারতের চিরন্তন সঙ্গীতের মূল সুর, ভারতীয় সত্তার মেরুদণ্ড স্বরূপ, ভারতীয়তার ভিত্তি, ভারতবর্ষের প্রেরণা ও বাণী। ..... যাবতীয় কল্যাণশক্তিকে মিলিত কর। তুমি কোন্ পতাকার নিম্নে থাকিয়া যাত্রা করিতেছ, সেদিকে লক্ষ্য করিও না। তোমার পতাকা নীল, সবুজ বা লোহিত তাহা গ্রাহ্য করিও না, সমুদয় রঙ্ মিশাইয়া প্রেমের শুভ্রবর্ণের তীব্র জ্যোতি প্রকাশ কর। আমাদের প্রয়োজন কার্য্য করিয়া যাওয়া ফল যাহা তাহা আপনি হইবে।'

(৪)

'সত্যিই তিনি (ঈশ্বর) আমার সঙ্গে এবং তাঁর সকল সন্তানের সঙ্গে কথা বলেন। আমরা তাঁকে আমাদের চতুর্দিকে দেখি এবং তাঁর প্রেমের অসীমতায় নিরন্তর প্রবাহিত হই, সেই প্রেম থেকে আমাদের মঙ্গল ও শুভকর্মের প্রেরণা লাভ করি।' প্রাচীনা হ'লেও শক্তি নিত্যা নবীনা, গুপ্তভাব থেকে ব্যক্তা হ'লেই নবীনা ব'লে প্রতীয়মানা হ'ন। শ্রীরামকৃষ্ণ যেমন ব'লতেন, 'চিকের আড়ালে দেবী সর্বদাই রহিয়াছে।' শক্তির হ্রাস নেই, বৃদ্ধি নেই, লোপ তো দূরের কথা। ঘন বা সূক্ষ্ম আবরণের মধ্য দিয়ে দেখেই আমরা শক্তির কখনও হ্রাস, কখনও বৃদ্ধি আবার কখনও বা একেবারে কল্পনা ক'রে থাকি মাত্র।

এইজন্যই তো দেবীসূক্তে বাগাম্ভৃনী বলেছেন,–'আমার দ্বারাই লোকে জীবিত আছে, অন্নগ্রহণ এবং শ্রবণাদি ক'রছে। আমাকে যে অবহেলা করে সে বিনষ্ট হয়। তুমি শ্রদ্ধাবান্, এজন্য তোমাকে এসকল ব'লছি। ব্রহ্মশক্তির হিংসক অসুরদের বধের জন্য ধনুর্ধারী রুদ্রের বাহুতে আমিই শক্তিরূপে অবস্থিতা ছিলাম। আমিই লোকরক্ষার জন্য যুদ্ধ কাজে নিযুক্তা হই। আমিই আকাশ এবং পৃথিবীর মধ্যে প্রবিষ্টা হ'য়ে আছি।'

স্বামী বিবেকানন্দ তাঁর সুযোগ্যা শিষ্যা ভগিনী নিবেদিতা

সম্বন্ধে বলেছেন,–

'ইংল্যাণ্ড আমাদের আর একটি উপহার দিয়েছে–এই মিস্ মার্গারেট নোবল–যাঁর কাছে আমাদের বহু প্রত্যাশা...মিস্ নোবল, সত্যই রত্নপ্রাপ্তি আমাদের ।....মিস্ নোবলের মত মেয়ে সত্যি দুর্লভ ।

শ্রীরামকৃষ্ণ ও স্বামী বিবেকানন্দের 'ত্যাগ ও সেবা'র আদর্শটিকে যিনি নিজের জীবনে সঠিকভাবে বাস্তবায়িত ক'রে গেলেন তিনি হ'লেন এক আইরিশ কন্যা মার্গারেট এলিজাবেথ নোবল– স্বামী বিবেকানন্দের যোগ্যা শিষ্যা মানসকন্যা নিবেদিতা ।

১৮৬৭ খ্রীষ্টাব্দের ২৮ শে অক্টোবর উত্তর আয়ারল্যাণ্ডের ডুঙ্গানন নামে এক ছোট শহরে মার্গারেট জন্মগ্রহণ করেন । তাঁর বাবা স্যানুয়েল রিচমন্ড নোবল পেশায় ধর্মযাজক ছিলেন এবং মায়ের নাম ছিল মেরি ইসাবেল । মার্গারেটের জন্মের আগে প্রথম সন্তানের জন্মের ভীতি ও ব্যাকুলতার জন্য তাঁর মা মেরি ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা ক'রেছিলেন যে, তাঁর সন্তানের নিরাপদে জন্ম হ'লে তিনি তা'কে ঈশ্বরের উদ্দেশ্যে উৎসর্গ করবেন । এরূপ এক পটভূমিকায় মার্গারেট বা নিবেদিতার জন্ম ।

তথাকথিত শিক্ষা সমাপ্ত হ'লে ১৮৮৪ খ্রীষ্টাব্দে শিক্ষয়িত্রীর ব্রত গ্রহণ করেন নিবেদিতা এবং ১৮৯২ খ্রীষ্টাব্দে নিজেই নিজের চেষ্টায় একটা বিদ্যালয় স্থাপন করেন ।

১৮৯৫ খ্রীষ্টাব্দের নভেম্বর মাসের এক রবিবারের অপরাহ্নে লণ্ডনের এক ড্রয়িং রুমে তাঁর প্রথম সাক্ষাৎ হয় স্বামী বিবেকানন্দের সঙ্গে– যাঁর ব্যক্তিত্ব, বেশভূষা, কথাবার্তার দ্বারা মার্গারেট বিশেষভাবে বিমোহিত হ'ন ।

স্বামিজীর কাছে বেদান্তের বাণী ও তার ব্যাখ্যা শুনে বেদান্তের উদার নীতি এবং সার্বজনীনতায় মার্গারেট বিশেষভাবে উদ্বুদ্ধ হ'ন এবং লণ্ডন ত্যাগ করার আগে স্বামিজীকে আচার্যরূপে বরণ করেন ।

স্বামিজীর আহবানে ভারতবর্ষের সেবায় আত্মনিয়োগ করার জন্য মার্গারেট প্রাচ্যের অভিমুখে যাত্রা করেন । তাঁর জাহাজ 'সম্বাসা' নামে কলকাতা বন্দর ২৮ শে জানুয়ারি ১৮৯৮ স্পর্শ করে । তাঁকে অভ্যর্থনা জানাতে স্বামী বিবেকানন্দ নিজেই জেটিতে অপেক্ষা করেন ।

১৮৯৮ সালের ১১ই মার্চ মার্গারেটকে সকলের সঙ্গে পরিচিত ক'রে দেওয়ার জন্য স্বামী বিবেকানন্দ 'স্টার থিয়েটারে নিবেদিতার একটি বক্তৃতার আয়োজন করেন । বিষয়বস্তু ছিল–'ইংল্যাণ্ডে ভারতীয় চিন্তার প্রভাব ।'

ঐ বছরের ১৭ই মার্চ স্বামিজীর ইচ্ছানুসারে বিদেশিনী শিষ্যাগণ মিসেস বুল, মিস ম্যাক লাউড এবং মার্গারেট বাগবাজারে ১০/২ নং বোস-পাড়া লেনের বাড়ীতে শ্রীশ্রীমায়ের সঙ্গে প্রথম দর্শন হয় । ঐ বিশেষ দিনটিকে মার্গারেট বা নিবেদিতা 'day of days' বলে উল্লেখ করেন ।

১৮৯৮ খ্রীষ্টাব্দের ২৫ শে মার্চ মার্গারেটের জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ দিন । মঠ তখন বেলুরমঠে নীলাম্বর বাবুর বাগানবাড়ীতে । মার্গারেট তখন মিসেস বুল এবং মিস ম্যাকলউডের সঙ্গে বেলুরমঠের জন্য সদ্য ক্রয় করা গঙ্গার তীরে অবস্থিত জমিতে একটা জীর্ণ বাড়ীতে কাজ করতেন ঐ দিন সকালে স্বামিজী মার্গারেটকে দীক্ষা দান করে তাঁকে 'নিবেদিতা' আখ্যায় বিভূষিত করেন । দিনটি ছিল খ্রীষ্টানদের কাছে অতি পবিত্র দিন–'The day of Annunciation'.

১৮৯৮ খ্রীষ্টাব্দের ২১ শে মে স্বামিজী নিবেদিতাকে নিয়ে হিমালয়ের উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন এবং পৌঁছান আলমোড়ায় । এই আলমোড়াতেই থাকাকালীন অবস্থায় নিবেদিতা স্বামিজীর সান্নিধ্যে পান এক দিব্যজীবনের পরশ । নিবেদিতা মনে-প্রাণে বুঝতে পারলেন আধ্যাত্মিক জীবনে উন্নতি লাভ ক'রতে হ'লে গুরুশক্তির প্রভাব অপরিসীম । আত্মসমর্পণের মনোভাব এখানে বিশেষভাবে প্রয়োজন স্বামিজী ২রা আগস্ট ১৮৯৮ নিবেদিতাকে সঙ্গে নিয়ে অমরনাথ পৌঁছান । অমরনাথের তুষারধবল শিবলিঙ্গটি দর্শন করেন তাঁরা । নিবেদিতার এখানে কোন আধ্যাত্মিক অনুভূতি হয়নি । নিবেদিতা স্বামিজীকে এই কথা নিবেদন করলে স্বামিজী বলেন–এখানেই নিবেদিতাকে শিবের কাছে উৎসর্গ করা হয় এবং তীর্থযাত্রার ফল নিবেদিতা অদূর ভবিষ্যতে নিশ্চয়ই বুঝবেন ।

স্বামিজীর ইচ্ছানুসারে শ্রীশ্রীমায়ের সান্নিধ্যে বাস করে আত্মোন্নতি ও কর্মজীবনে অগ্রসর হওয়ার জন্য নিবেদিতা ১৮৯৮ খ্রীষ্টাব্দের ১লা নভেম্বর থেকে ১৮৯৯ খ্রীষ্টাব্দের ১৯ শে জুন পর্যন্ত বাগবাজারে ১৬ নং বোসপাড়া লেনের বাড়ীটিতে বসবাস করেন ।

১৮৯৮ খ্রীষ্টাব্দের ১৩ ই নভেম্বর কালীপূজোর দিন শ্রীশ্রীমা ঐ বাড়ীতেই নিবেদিতার বালিকা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার কাজ সম্পন্ন করেন এবং পরের দিন অর্থাৎ ১৪ ই নভেম্বর স্বামী বিবেকানন্দ, স্বামী ব্রহ্মানন্দ, স্বামী বিরজানন্দ এবং স্বামী সুকেশ্বরানন্দের শুভ উপস্থিতিতে বিদ্যালয়ের শুভ সূচনা করা হয় ।

১৮৯৯ খ্রীষ্টাব্দে কোলকাতায় প্লেগের প্রাদুর্ভাব দেখা দিলেএই রোগ প্রতিরোধের সবপ্রকারের ব্যবস্থা করার দায়িত্ব নিবেদিতার উপর অর্পণ করেন স্বামিজী । নিবেদিতা ঐকান্তিক ভালবাসা, আত্মপ্রত্যয় এবং সেবা কাজের মাধ্যমে

এই কাজে বিশেষভাবে সফল হন ।

১৮৯৯ খ্রীষ্টাব্দের ২৫ শে মার্চ নিবেদিতা নামকরণের এক বছর পর নিবেদিতার প্রার্থনা অনুযায়ী স্বামিজী নিবেদিতাকে নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারিণীরূপে দীক্ষিত করে রামকৃষ্ণ সঙ্ঘের অন্তর্ভুক্ত করেন ।

১৮৯৯ খ্রীষ্টাব্দের ২০ শে জুন স্বামিজীর নির্দেশে স্বামিজীর সঙ্গে যাত্রা করেন নিবেদিতা পাশ্চাত্ত্যের অভিমুখে । উদ্দেশ্য– সেখানে বক্তৃতা দিয়ে তাঁর ঈপ্সিত বিদ্যালয়ের জন্য অর্থসংগ্রহ করা ।

১৯০২ খ্রীষ্টাব্দের ৯ই ফেব্রুয়ারি নিবেদিতা ভারতবর্ষে প্রত্যাবর্তন করেন । আবার প্রতিষ্ঠিত হন তাঁর অতি প্রিয় বোসপাড়া লেনের পাশের বাড়ী ১৭ নম্বরে ।

১৯০২ খ্রীষ্টাব্দের ৪ঠা জুলাই, নিবেদিতা স্বপ্ন দেখেন শ্রীরামকৃষ্ণ যেন রাতে পুনরায় দেহত্যাগ করলেন । পরের দিন ভোরেই স্বামিজীর মহাপ্রয়াণের কথা জানতে পারেন নিবেদিতা–স্বামী সারদানন্দের পত্রের মাধ্যমে ।

দ্বিতীয়বার ভারতবর্ষে আসার পর নিবেদিতা ভারতবর্ষের স্বাধীনতা-সংগ্রামের সঙ্গে বিশেষভাবে জড়িয়ে পড়েন যা' স্বামী বিবেকানন্দ নির্দেশিত রামকৃষ্ণ সঙ্ঘের আদর্শের পরিপন্থী । স্বামী ব্রহ্মানন্দ এবং স্বামী সারদানন্দ ঠিক করলেন যে রামকৃষ্ণ সঙ্ঘের সদস্য থাকতে হ'লে নিবেদিতাকে রাজনীতির সঙ্গে যাবতীয় সংস্রব ত্যাগ ক'রতে হবে । খুবই দুঃখের সঙ্গে নিবেদিতা ১৮ই জুলাই ১৯০২ এক চিঠিতে স্বামী ব্রহ্মানন্দকে গভীর দুঃখের সঙ্গে সঙ্ঘের সঙ্গে যাবতীয় সম্পর্ক ছিন্ন করার সিদ্ধান্তের কথা জানান । চিঠির শেষে তিনি লেখেন,–'Nivedita of Ramakrishna.' পরবর্তীকালে তিনি লিখতেন– 'Nivedita of Ramakrishna-Vivekananda' –আগে লিখতেন নিবেদিতা,– 'Nivedita of the Ramakrishna orders.'

ঠাকুর রামকৃষ্ণ দরিদ্রকে নারায়ণজ্ঞানে সেবার যে ইঙ্গিত দিয়েছিলেন, স্বামী বিবেকানন্দ তাঁর এই আদর্শ রূপায়ণের জন্য বিশেষভাবে সচেষ্ট ছিলেন । তাঁর বাণীই তাঁর সাক্ষ্য বহন করে,–

'বহুরূপে সম্মুখে তোমার
ছাড়ি কোথা খুঁজিছ ঈশ্বর
জীবপ্রেম করে যেইজন
সেইজন সেবিছে ঈশ্বর ।'

এই 'ত্যাগ ও সেবা'র মন্ত্রে উদ্বুদ্ধ হ'য়েছিলেন বিবেকানন্দরই মানসকন্যা যোগ্যা শিষ্যা লোকমাতা ভগিনী নিবেদিতা ।

তরুণ ছাত্র-সম্প্রদায়ের উপর নিবেদিতার প্রভাব ছিল অপরিসীম । তিনি যখন তাদের কাছে গীতা ব্যাখ্যা করতেন অথবা বিবেকানন্দের বাণী প্রচার করতেন, তখন তাঁর মধ্য দিয়েই ভারতবর্ষের প্রকৃত স্বরূপ বা মর্মার্থ উপলব্ধি হ'ত, পরাধীন অসহায় দুর্বল জাতির মর্মবেদনা তাদের বিদ্ধ করত, বীরত্ব ও পৌরুষের আবেগে তাদের অন্তর পূর্ণ হয়ে যেত । ভগিনী নিবেদিতার বক্তৃতা শুনে অনুপ্রেরণা লাভ করেনি, এমন মানুষ সে-সময় খুবই কম ছিল ।

সাধারণভাবে ইংরেজ জাতির প্রতি তাঁর বিরাগ নানাভাবে প্রকাশ পেত । বিদেশীর কোন প্রভুত্বসূচক দম্ভ তিনি সহ্য করতে পারতেন না । একবার দীনেশ সেনের সঙ্গে নিবেদিতা ট্রামে করে কোথাও যাচ্ছিলেন; তখন একজন ইংরেজ ব্যক্তি ট্রামে উঠে তাঁর ঘনিষ্ঠ হ'য়ে বসার চেষ্টা করলে নিবেদিতা তার দিকে এমন ভাবে তাকালেন যে, সাহেব মুখ নীচু ক'রে অন্য সিট-এ যেয়ে বসে । নিবেদিতা তখন দীনেশবাবুর আরও কাছে এসে হেসে হেসে তাঁর সঙ্গে গল্প করতে থাকেন ।

নিবেদিতা সবসময় চেষ্টা করতেন আচার-আচরণ, ভাষা, বেশভূষা, শিক্ষা, সঙ্গতি ইত্যাদি সবকিছুর মধ্য দিয়েই ছাত্রীদের মধ্যে জাতীয়তাবোধের ভাবটি সঞ্চারিত ক'রে দিতে । প্রতিদিন তাঁর বিদ্যালয়ে 'বন্দেমাতরম্' গাওয়ার প্রচলন করেছিলেন তিনি ।

স্বামিজীর মতো নিবেদিতার মধ্যে স্বদেশপ্রেম (ভারতপ্রেম) মূর্ত হ'য়ে উঠেছিল । তাঁর মুখে সবসময় উচ্চারিত হ'তো ; ভারতবর্ষ, ভারতবর্ষ । 'ভারতবর্ষ' শব্দটি তিনি ভাববিহ্বল হৃদয়ে জপ করতেন, আর ভারতবর্ষের খুঁটিনাটি সব-কিছুই তিনি অত্যন্ত শ্রদ্ধার চোখে দেখতেন । ভারতবর্ষের যে-কোনো আচার তিনি পরমশ্রদ্ধার সঙ্গে পালন করতেন । গঙ্গার ঘাটে নৌকোয় উঠবার আগে হিন্দু-নারীর মত তিনি গঙ্গাজল মাথায় ছেটাতেন । কোন মন্দির বা বিগ্রহের সামনে এলে করজোড়ে তিনি আত্মনিবেদন বা প্রণাম করতেন ।

ভারতবর্ষ নিবেদিতার কাছে ছিল পুণ্যভূমি, আর এখানকার প্রতিটি মানুষই পুণ্যাত্মা । তাঁর বাড়ীতে যে গোয়ালা দুধ দিত, একদিন সে ধর্ম সম্বন্ধে নিবেদিতার কাছে কিছু শুনতে চায় । অত্যন্ত লজ্জাশীলা হ'য়ে তাকে নমস্কার করে নিবেদিতা বলতে থাকেন, 'তুমি ভারতবাসী, তুমি আমার কাছে কী উপদেশ চাও? তোমরা কী না জান? তুমি শ্রীকৃষ্ণের জাতি, তোমাকে আমি নমস্কার করি ।

শ্রীশ্রীমায়ের দর্শন লাভ ক'রে ভারতীয় নারীদের সম্বন্ধে এত উঁচু ধারণা হ'য়েছিল যে, নিবেদিতা জোরের সঙ্গে বলেন, 'ভারতবর্ষের মেয়েরা অজ্ঞ কখনোই নয় । ওদেশের

(পাশ্চাত্তের) মেয়েদের মুখে এমন সব জ্ঞানের কথা কেউ কখনও শুনেছে?

১৯১১ খ্রীষ্টাব্দের ১৩ই অক্টোবর দার্জ্জিলিং-এর রায়ভিলায় থাকার সময় অত্যন্ত অসুস্থ নিবেদিতার মুখমণ্ডল সকাল ৭টার সময় হঠাৎ এক দিব্য-জ্যোতিতে উদ্ভাসিত হয় । করুণ সুরে তিনি ব'লে ওঠেন, 'The best is sinking But I shall see the sunrise' এই ছিল স্থূলশরীরে তাঁর জীবনের অন্তিম দিন ।

দার্জ্জিলিং-এর রায়-ভিলা বর্তমানে বেলুড় রামকৃষ্ণ মিশনের একটি শাখাকেন্দ্র–নাম রামকৃষ্ণ মিশন নিবেদিতা এডুকেশন অ্যান্ড কালচারাল সেন্টার । শারীরিক অসুস্থতার মধ্যেও নিবেদিতা পরিচিত-অপরিচিত বন্ধু-বান্ধবদের অভ্যর্থনা জানাতেন । নিবেদিতার চিন্তার বিষয় ছিল শেষের দিকে–'আমাদের মেয়েদের শিক্ষা ।' অলোকসামান্য প্রতিভার অধিকারিণী ছিলেন লোকমাতা নিবেদিতা । তাঁর অন্তিম শোক যাত্রায় উপস্থিত ছিলেন জগদীশচন্দ্র বসু, অবলা বসু, প্রফুল্লচন্দ্র রায়, ভূপেন্দ্রনাথ বসু, নীলরতন সরকার প্রমুখ বিশিষ্ট জন । নিবেদিতার অসুস্থতার সংবাদ পেয়ে বেলুড় মঠ থেকে প্রেরিত ব্রহ্মচারী গণেন্দ্রনাথ তাঁর মুখাগ্নি করেন বিকেল ৪ টে ১৫ মিনিটে । তাঁর দেহরূপ আত্মা বিলীন হ'য়ে যায় অসীম-অনন্ত সত্তায় ।

দার্জিলিং-এর যেখানে লোকমাতা নিবেদিতাকে দাহ করা হয়েছিল, সেখানে এক স্মৃতি স্তম্ভে এখনও লেখা আছে,–'Here reposes Sister Nivedita who gave here all to India.'

"জপ মালা কর-এ রয়ে জপেছিলে নিশিদিন
ভারত, ভারত ।
মাগিয়া লইয়াছিলে গুরু পাদপদ্মতলে
তোমার সে ব্রত ।
পূণ্যব্রতে দেবব্রতে, ব্রত আজ হল পূর্ণ
পূর্ণ মনোরথ ।
ভারতে গিয়াছ মিশে পেয়েছ প্রাণের মাঝে
তোমার ভারত ॥"

লোকমাতা নিবেদিতা সম্বন্ধে বরেণ্য কয়েকজন মনীষীর অভিমত

১ । শ্রীঅরবিন্দ– 'she was a veritable live wire Mother kali through Sister Nivedita ordered me to hide.'

২ । সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়– 'নিবেদিতা তাঁর প্রতিটি কার্য, প্রতিটি চিন্তা, জীবনের প্রত্যেক আবেগের অন্তর্বর্তী করে নিয়েছিলেন ভারতের আশা ও আদর্শকে ।'

৩ । গোপালকৃষ্ণ গোখলে– 'তাঁর (নিবেদিতার) ব্যক্তিত্ব অপূর্ব ও চমকপ্রদ । তা এমনই যে, তাঁর সাক্ষাতে এলে মনে হতো বুঝি, কোনো বিরাট নৈসর্গিক শক্তির সম্মুখীন হয়েছি ।'

৪ । প্রব্রাজিকা ভারতীপ্রাণা–'কী কঠিন সাধনায় নিবেদিতা .... অত্যন্ত রক্ষণশীল প্রাচীন পরিবারগুলির প্রায় দুর্ভেদ্য সংস্কারের প্রাচীর ভেদ করে অন্তঃপুর-চারিণীদের তাঁর বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে সমবেত করতে পেরেছিলেন ... । কেবলমাত্র অসাধারণ ত্যাগ ও পরার্থ-পরতার জন্যই তিনি প্রবলতম বাধার অগ্নিপরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে পেরেছিলেন ।'

সেই অন্ধ পাশ্চাত্ত্য অনুকরণের যুগে দেখেছি আমাদের মতো ছাত্রীদের মধ্যে স্বদেশানুরাগের প্রেরণা জাগাতে তাঁর কী আগ্রহই ছিল ।'

৫ । বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর– 'বস্তুত তিনি ছিলেন লোকমাতা । যে মাতৃভাব পরিবারের বাইরে একটি সমগ্র দেশের উপর নিজেকে ব্যাপ্ত করতে পারে তার মূর্তি তো ইতিপূর্বে দেখি নি । এ-সম্বন্ধে পুরুষের যে কতর্ব্যবোধ তার কিছু কিছু আভাস পেয়েছি, কিন্তু রমণীর যে মমত্ববোধ তা' প্রত্যক্ষ করি নি । তিনি যখন বলতেন Our People তখন তার মধ্যে যে একান্ত আত্মীয়তার সুরটি লাগত, আমাদের কারো কণ্ঠে তেমনটি তো লাগে না ।'

৬ । আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু বলেছেন,–'সকল বিষয়ে তাঁর অসামান্য প্রতিভা, গভীরজ্ঞান ও সূক্ষ্ম দৃষ্টি ছিল । যদি তিনি তাঁর স্বদেশে ইউরোপে কাজ করতেন তবে নাম, যশ, অর্থ তাঁর পায়ে লুটিয়ে পড়ত । সে সব ত্যাগ করে প্রায় অর্ধাহারে তিনি আজীবন আমাদের দেশের জন্য তিলে তিলে প্রাণ দিলেন । তিনি সত্যই কল্যাণে নিজের জীবন উৎসর্গ করেছিলেন ।'

৭ । ঐতিহাসিক রমেশচন্দ্র মজুমদার বলেছেন,– 'জীবনের প্রারম্ভে তাঁর (নিবেদিতার) প্রতি যে শ্রদ্ধা ও ভক্তির উদ্রেক হয়েছিল জীবনের সায়াহ্নে তা শতগুণে বর্ধিত হয়েছে । আর্তের সেবা, নারীজাতির শিক্ষা ও আমাদের সম্পূর্ণরূপে উৎসর্গ করেছিলেন ।'

৮ । নেতাজী সুভাসচন্দ্র বসু বলেন,– 'ভারতবর্ষকে আমি ভালবেসেছি বিবেকানন্দ পড়ে । আর বিবেকানন্দকে আমি চিনেছি নিবেদিতার লেখায় ।'

সামগ্রিক কল্যাণ ও ভারতবর্ষের স্বাধীনতার জন্য নিবেদিত প্রাণাহে লোকমাতা নিবেদিতা! সার্ধশতবর্ষোপলক্ষ্যে তোমারে জানাই আমার অসংখ্য প্রণাম !

গান/কবিতা

রাস্তা
তুলিরাণী ঘোষ

ঐ তো সেই ছোট্ট মেয়েটা,
হ্যাঁ হ্যাঁ সেই মেয়েটা,
যার পরণে ছিল লাল জামা
এ যে শুধু লাল জামা নয়,
এ যেন এক ক্ষোভের প্রতীক ।

এই তো সেই ছোট্ট মেয়েটা!
তাই না,
যার চোখ দুটো সেদিন ছিল
জল ছল ছল ।
এ যে শুধু চোখের জল ছিল না
ছিল নীরবে সহ্য করা যন্ত্রণা ।

হ্যাঁ হ্যাঁ ঐ সেই মেয়ে
এখন যার হাতে থাকার কথা ছিল কলম ।
কিন্তু আছে কি জান?
একটা "ঝাটা"
সে নীরবে করছে পরিষ্কার
রাস্তাটা !!
এভাবে কি পরিষ্কার হবে
আমাদের সমাজের রাস্তাটা?

মা, কেন ঐ বৃদ্ধাশ্রমে?
তুলিরাণী ঘোষ ।

মা, তোমার জন্যই দেখেছি
এই পৃথিবীর আলো
তোমার জন্যই পেয়েছি
একটা ছোট ঘর ।
তবে কেন মা–
তোমার স্থান এখন ঐ আশ্রমে?
মা, তুমিই প্রথম বুঝেছ আমার প্রয়োজন
আমার মুখে তুলে দিয়েছ খাবার
কিন্তু আজ যখন তুমি ক্ষুধায় কষ্ট পাচ্ছ
তখন কেন মা–
কেউ নেই তোমার মুখে খাবার তুলে দেবার?
যখন ছিলাম অসুস্থ
রাতের পর রাত তুমিই জেগেছ মা,
আমার পাশে ।
তবে আজ যখন তোমার,
আমায় বড্ড প্রয়োজন
তখন কেন মা তোমার স্থান ঐ আশ্রমে?

মা, তোমার হাত দুটি ধরেই
চলতে শিখেছি ।
যখন হোচট খেয়েছি
তুমিই নতুন করে চলতে শিখিয়েছ ।
তবে আজ যখন
তোমার লাঠিটা পড়ে যায়
তখন কেন মা ঐ লাঠিটা তোলার কেউ নাই?

কেন মা
আজ তুমি ঐ বৃদ্ধাশ্রমে?

তুমিই বল মা,
যে সন্তান তোমার গুরুত্ব বোঝে না,
দেয় না তোমার প্রাপ্য সম্মান ।
সে কিভাবে বুঝবে
সমাজের গুরুত্ব
কিভাবে করবে সমাজের মানুষের সেবা?

একটুখানি চোখ রাখুন

ইষ্টপ্রাণ দাদা/মায়েরা, সন্দীপনার চলার পথকে সাবলীল করার লক্ষ্যে আপনার বার্ষিক বকেয়া গ্রাহক চাঁদা পরিশোধ করুন । সেই সাথে প্রাতিষ্ঠানিক ও ব্যক্তিগত বিজ্ঞাপন দিয়ে সন্দীপনার কলেবর বৃদ্ধিতে সহযোগিতা করুন ।

-সম্পাদক

চিরঞ্জীব বনৌষধি

(১ম খণ্ড)

আয়ুর্ব্বেদশাস্ত্রী শ্রীশিবকালী ভট্টাচার্য্য

ক্ষুরক (কুলেখাড়া)

সনাতনপন্থীরা শব্দস্তোমের মহাসাগর থেকে যেসব শব্দরত্ন আহরণ করেছিলেন, তাদেরই এক একটি যোগ বিযোগে কত ব্যঞ্জনাই না সাহিত্যিকের মনে জাগে; এই যেমন ক্ষুর শব্দটি এর আগু পিছু কোন শব্দের যোগ বিযোগ করলে ভিন্ন অর্থ বহন করে সত্যি কিন্তু তার মৌলিক ক্রিয়াকারিত্বের স্বভাবটা বদলায় না তবে রকমফের হয়।

উপরিউক্ত শিরোনামের সৃষ্টি কিন্তু ক্ষুর শব্দ থেকে; আমরা যেমন বলে থাকি আহাঃ মেয়েটির মুখ নয় তো যেন ক্ষুরে ধার সেইরকম বুদ্ধিটার ক্ষেত্রেও বিশেষিত করে বলা হয় ক্ষুরধার বুদ্ধি। আবার ক্ষুর শব্দটি ভ্রষ্ট হয়েছে খেউড়ে এসেছে।

এই যে আমরা বলে থাকি লোকটা খেউড় কবি সেইটাই আরও সহজিয়া হয়ে খেড় কবি হয়ে গিয়েছে। আসলে এই ক্ষুর শব্দটির অর্থ বিলেখন অর্থাৎ আঁচড়ে দেওয়া। উপরিউক্ত বনৌষধিটির এই ক্ষূরক নামকরণের দ্বারাই তার ক্রিয়াকারিত্বকে চিহ্নিত করা হ'য়েছে, আর তার সেই দ্রব্যশক্তির ইঙ্গিতটা অথর্ববেদেই দেওয়া হ'য়েছে বৈদ্যককল্পের ৩৭/৩১১/৫ সূক্তে–

মলিম্লুঞ্জন্ দ্রষ্ট্রিম্ভৈস্তস্করা উতহনূভ্যাং দেহ্যনমীবস্য শুষ্মিণঃ।
তারিষ উর্জ্জং দ্বিপদে চতুষ্পদে নো ধেহি।

এই সূক্তটির মহীধর ভাষ্য করেছেন–

ত্বং ক্ষুরোহসি। ক্ষুরকোহসি বা। ক্ষুর+বিলেখনে। ক্ষুর+অ। ত্বং মলিমুঞ্জন দ্রষ্ট্রিম্ভৈঃ= যে দ্রংষ্ট্রিনঃ তেভ্যৎ মলিমুঞ্জনাৎ= নিঃশেষণাৎ রক্ষণাদ বা ক্ষুরোহসি= বিলেখকোহসি কণ্টকাঙ্গঃ নিশিতস্করাঃ চৌর্য্যয় অসমর্থাঃ। উতবা হনূভ্যাং তেষাং দ্রংষ্ট্রিম্ভৈঃ= তব দেহৈঃ। স ত্বং শুষ্মিণঃ শুষ্মমিতি বলং বিদ্যতে ত্বয়ি। দ্বিপদে মনুষ্যেচতুষ্পদে উর্জ্জং ইবস্য= শুক্রস্য তারিষ বিসর্গরোধং করোতি যঃ সঃ ত্বং ধেহি ধারয়।

এই ভাষ্যটির অর্থ হ'ল–তুমি ক্ষুর, ক্ষুরকও তোমার নাম। ক্ষুর অর্থে বিলেখন (একে বলা হয় আঁচড়ে দেওয়া), তোমাকে দ্রংষ্ট্রিগণ নিঃশেষ করতে পারে না, যেহেতু তুমি কণ্টকাঙ্গ হয়ে আছ এবং রাত্রে চৌরগণ তোমাকে লঙ্ঘন করে চুরি করতে পারে না, যেসব দ্রংষ্ট্রি তোমার কাছে আসে, তুমি তোমার দেহের হনূ দ্বারা তাদিকে নিবৃত্ত কর। তুমি দ্বিপদ মনুষ্য ও চতুষ্পদের শুক্রবল রক্ষা কর। শুক্রের বিসর্গপথের অর্থাৎ নিঃসরণ পথের বাধা দূর করে দাও।

বৈদ্যকের নথি

বৈদিক তথ্য থেকে কি পাওয়া গেল?

(১) এই ওষধির বিলেখন করার শক্তি আছে।

(২) তুমি মানুষের এমন কি পশুরও শুক্রবল রক্ষা কর।

(৩) শুক্রের বিসর্গপথের অর্থাৎ নিঃসরণ পথের বাধা দূর করতে পারো।

সংহিতা যুগের দৃষ্টিকোণ

চরক সংহিতায় ক্ষুরক এই বৈদিক নামটিতে 'ই' কার আগম করে ব্যবহার করেছেন, ভারতীয় ভাষায় বর্ণের আগম এবং বর্ণের লোপ বর্ণের বিপর্যয় করার স্থল বহু আছে, তাদের মধ্যে এই ক্ষুরক শব্দেও 'ই' কারটি আগম বর্ণ। একে পৃষোদর বলে। অর্থাৎ 'ই' কারকে যুক্ত করা হয়েছে ; তবে এই 'ই' কারকে যুক্ত করতে গভীর অর্থের ইঙ্গিত পাওয়া যাচ্ছে, ইক্ষু শব্দের অর্থের সঙ্কেত হলো মধুর রসের গন্ধ, এই কূলে খাড়ার রসে ইক্ষু বা আখের রসের গন্ধ পাওয়া যায়। চরক সংহিতায় এর প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে শুক্রশোধনের উপযোগিতার ক্ষেত্রে। আর অশ্মরী চিকিৎসায় যে তার প্রাধান্য আছে, সেটাও স্বীকৃত হয়েছে তবে তাঁদের মত এক্ষেত্রে মূলটাই বেশী কার্যকর।

এই দুটি ক্ষেত্র সম্বন্ধে বোঝার বিষয় হ'লো– যেখানে শুক্রশোধনের ক্ষেত্রে এটি ব্যবহৃত হয়, সেখানে অবশ্যই জেনে নিতে হয়, মজ্জ ধাতুর অর্থাৎ সপ্তম কলার স্থান থেকে। এটি একটি পদার্থ (শুক্র) যেটি সর্বদেহগত হ'য়েও বস্তিদ্বারের দুই আঙ্গুলে দক্ষিণে এর কলা বা আধার থাকে, রমণীদের দেহেও ঐ স্থানে থাকে। কোন কারণে সেই শুক্র বিমার্গ অর্থাৎ বায়ু, পিত্ত ও শ্লেষ্মা ধাতুর বিকার হ'লে অথবা অতিমৈথুনের দ্বারা মেঢ্র ও মুষ্কের অভ্যন্তরে যে শুক্রবহ স্রোতের নল তাকে সে রুদ্ধ করে। এই ক্ষেত্রে এর মূলের উপযোগিতা স্বীকৃত।

পরিচিতি

প্রাচীন বোটানীতে–অথর্ববেদে তাকে বলা হলো 'ক্ষুরক' অর্থাৎ সে চেছে বার করে দেয়। দ্বিতীয় নাম ইক্ষুরক। তার ডাঁটার রসে আছে 'ইক্ষু' অর্থাৎ আখের রসের গন্ধ ও অল্প মিষ্টত্ব, আর বলা হলো দ্রংষ্ট্রা, অর্থাৎ এই নাম দেওয়ার কারণগাছের পর্বে পর্বে খুব কাটা হয়, যার জন্য তাকে কোন চতুষ্পদ জন্তু নির্মূল করে খেতে পারে না এবং চোরেও তাকে ডিঙ্গিয়ে যেতে পারে না। এটা তার দেহগত বর্ণনা।

সংহিতার যুগে এসে তার নাম হলো কোকিলাক্ষ। এই নামকরণের তাৎপর্য হলো– তার বীজগুলির রং দেখতে যেন

কোকিল পাখির চোখের রংয়ের মত, এ ভিন্ন আর যতগুলি নাম পাওয়া যায় সবই তার গুণবাচী ।

দেখতে কেমন? সাধারণত পুরনো মূল থেকে ফেঁকড়ি বেরিয়ে গাছও হয়, আবার বীজ থেকেও গাছ হয়; বর্ষাকালে যখন নূতন গাছ গজায় তখন দেখতে অনেকটা হিঞ্চে (Enhydra fluctuans) শাকের গাছের মত, তবে তার পাতা এই হিঞ্চে শাকের পাতা থেকে একটু লম্বা; সমগ্র পাতার গায়ে সরু সুঁয়োর মত কাঁটা আছে । প্রথম দিকে গাছের কোন কাঁটা হয় না ; আশ্বিন-কার্তিকের পর থেকে পাতার গোড়া থেকে কাঁটা বেরোয় ক্ষুপ জাতীয় গাছ দেড় দুই ফুট উঁচু হয় আবার জায়গা হিসেবে ৩/৪ ফুটও উঁচু হতে দেখা যায় যেখানে হয় সেখানে ঝোপ হয়ে যায় সাধারণত জমির আলে অথবা রাস্তার পাশে অল্প জল যেখানে থাকে যাকে আমরা গাঁয়ের ভাষায় পগার বলি সেখানে হয়ে থাকে । মূলে বহু শিকড় হয় গাছের কাণ্ডটা একটু ফাঁপা এবং চতুস্কোণ অর্থাৎ চারকোণা হয় ফূল হয় অগ্রহায়ণ-পৌষ মাসে রং অল্প বেগুনে । বীজ ভিজালে চটচটে ও লালার মত হয় । একে চলিত কথায় কুলেখাড়ার গাছ আবার কোন কোন জায়গায় কুল্‌পো শাক বলে । এটির হিন্দি নাম তালমাখনা বোটানিকাল নাম Asteracantha Longifolia Nees, ফ্যামিলি Acanthaceae.

রোগ প্রতিকারে

১ । শোথে ঃ– পায়ের চেটো (যে অংশটার উপর ভর দিয়ে আমরা হেঁটে বেড়াই) ফোলে, এটা সাধারণতঃ পেটে আম (অপক্ক মল) জমার জন্য হয় সেক্ষেত্রে কেবল মাত্র পাতার রস (ডাঁটা বাদ) ৪ চা-চামচ একটু গরম করে করে ছেঁকে সকালে ও বৈকালে দুবার খেতে হবে এর সঙ্গে ২/৫ ফোঁটা মধু দেওয়াও চলে । এর দ্বারা ঐ ফুলোটা চলে যাবে ।

২ । পাণ্ডু রোগে ঃ– এ রোগের লক্ষণ হলো শরীরের রং ফ্যাকাশে হওয়া (হলদে নয়) যাকে প্রচলিত ভাষায় বলা হয় 'এনিমিয়া' । এক্ষেত্রে অমোঘ ঔষধ হলো কেবলমাত্র কুলেখাড়া পাতার রস ৪ চা-চামচ একটু গরম করে দুবেলা খাওয়া ।

৩ । বাতরক্তে ঃ– যে রোগে শরীরের ক্ষত হয় ফেটে যায় রস গড়ায় আয়ুর্বেদে এটাকে বলা হয় বাতরক্ত এক্ষেতেও সমগ্র গাছকে থেঁতো করে ৪ চা-চামচ রস একটু গরম করে দুবেলা খেতে হয় । এটা কিন্তু বাগভটের উপদেশ । এর সঙ্গে ঐ রস যদি গায়ে মাখা যায় তাতে আরও তাড়াতাড়ি উপশম হয় । এটা বাংলার বৈদ্যককুলের প্রত্যক্ষ উপলব্ধ যোগ ।

৪ । অনিদ্রায় ঃ– কুলেখাড়া শিকড়ের (মূলের) রস ২ থেকে ৪ চা-চামচ সন্ধ্যার পর খাওয়ালে সুখনিদ্রা হয় এটা হারীত সংহিতার উপদেশ ।

৫ । অশ্মরী (পাথুরী) রোগে ঃ– সে পিত্তের থলিতেই হোক আর কিডনিতেই হোক পিত্তবিকারে যে পাথুরী (stone) হয় সেখানে কুলেখাড়া বীজ আধ চা-চামচ আধ গ্লাস জলে গুলে সবটাই খেতে হয় ।

৬ । দীর্ঘস্থায়ী সম্ভোগে ঃ– যাঁরা ইচ্ছুক তাঁরা শোধিত আত্মগুপ্তা (আলকুশী– Mucuna Prurita) বীজের গুঁড়ো আধ চামচ ও কুলেখাড়া বীজের গুড়ো আধ চামচ একসঙ্গে গরম দুধে গুলে খাবেন এটার দ্বারা ঐ উদ্দেশ্যটা সিদ্ধ হবে । তবে এখানে একটা কথা বলা দরকার যে তামলাখনা হলো কুলেখাড়া বীজ– এই যে অনেকের ধারণা আছে সেটা কিন্তু ঠিক নয় বাজারে যেটা তালমাখনা বলে বিক্রি হয় ওটা পৃথক দ্রব্য আর বাজারে যেটা কুলেখাড়া বা কোকিলাক্ষ বীজ বলে বিক্রি হয় ওটাও কুলেখাড়া বীজ নয় । আসল কুলেখাড়া বীজের রং অবিকল কোকিলের চোখের রং হবে ।

৭ । শোথে ঃ– সে যকৃৎ দোষেই হোক আর কিডনির হোক এই শোথ চলে যায় যদি সমগ্র গাছ অন্তর্ধুমে দগ্ধ করে অর্থাৎ মুখঢাকা পাত্রে পুড়িয়ে যে ছাই পাওয়া যাবে সেটাকে গুঁড়ো করে দুবেলা এক গ্রাম (১৫ গ্রেণ) করে ঠাণ্ডা জল দিয়ে খাওয়া যায় এর দ্বারা প্রস্রাব পরিষ্কার হবে এবং কয়েকদিনের মধ্যেই ফুলো কমে যাবে এটা চক্রদত্তের উপদেশ ।

৮ । রক্তরোধে ঃ– উড়িষ্যার গ্রামাঞ্চলে ক্ষেত-খামারে (ধান কাটার সময়) কোন কিছুতে হাত বা পা কেটে বা ছড়ে গিয়ে রক্ত পড়তে থাকলে এই পাতাকে থেঁতো করে ঐ কাটায় চেপে দিয়ে বেঁধে দিয়ে থাকে এর দ্বারা অতি শীঘ্রই রক্ত বন্ধ হয়ে যায় আর ক্ষতও শুকিয়ে যায় ।

৯ । হারপিসেঃ– একে পোড়া নারেঙ্গাও বলে এটি পিত্ত-শ্লেলষ্মা-বিকৃতিজনিত রোগ এ রোগে কুলেখাড়ার পাতা কাঁচা হলুদ একসঙ্গে বেটে লাগাতে হয় এটাতে জ্বালা যন্ত্রণা চলে যাবে এবং ক্ষতও শুকিয়ে যাবে ।

১০ । শীতলী রোগে ঃ– পায়ের শিরাগুলি কাল ও মোটা হয়ে কুঁচকে কেঁচোর মত জড়িয়ে যায় তার জন্য যন্ত্রণাও হয় এক্ষেত্রে ঐ গাছপাতা বাটা লাগালে কাজ হবে এর সঙ্গে ঐ কুলেখাড়ার পাতা রস করে ৪/৫ চা-চামচ করে খেতে হবে ।

১১ । বাজীকরণে ঃ– অকালে যাদের যুবজনোচিত রতিশক্তি কমে গিয়েছে সেক্ষেত্রে এই কুলেখাড়ার মূল চূর্ণ ২ গ্রাম দুধ সহ খেলে এই অসুবিধেটা কিছুদিনের মধ্যে উপশমিত হয় । এটা চরক সংহিতার চিকিৎসাস্থানে ২৬ অধ্যায়ে বলা হয়েছে । এই উদ্দেশ্যে সুশ্রুত সংহিতায়ও ব্যবস্থা দেওয়া হয়েছে ধারোষ্ণ দুধের সঙ্গে ।

১২ । ক্রোধী ঃ– কোন অল্প কারণে হঠাৎ রেগে যায় হিতাহিত জ্ঞানশূন্য হয় বিশেষতঃ শৈশবাবস্থায়ও এটা দেখা যায় যে অনেকে জেদীও থাকে এক্ষেত্রে এই কুলেখাড়া পাতা ও ডাঁটা দিয়ে ঝোল করে বেশ কিছুদিন খাওয়ালে ওটার পরিবর্তন দেখা যাবে । আরও একটা লাভ হবে এটাতে যকৃৎকে (লিভারকে) সক্রিয় করবে ।

এই নিবন্ধটির শেষ অঙ্কে একটা কথা বলে রাখি কোন ভেষজের জন্মলগ্ন কবে এবং কোথায় সেটাও যেমন আমাদের অঙ্কের বাইরে, তার রাশিচক্র বিচার করে নাম করণের নথিপত্র নেই সত্যি, তবে আমাদের পূর্বসূরিগণ কানা ছেলের নাম পদ্মলোচন যে দেননি, সেটা আমরা বাস্তবে দেখতে পাচ্ছি তাই এই ক্ষুরক শুধু একটাকে চাঁছায় না, আবার মেরামতও করে ।

সৎসঙ্গ সমাচার

সুনামগঞ্জ

গত ৯ ই চৈত্র ১৪২৩ বাংলা রোজ বৃহস্পতিবার, দিরাই উপজেলার শ্যামারচর নিবাসী শ্রীসুরেশ দে (সৎসঙ্গী) মহোদয়ের বাসভবনে এক সন্ধ্যাকালীন অধিবেশনের আয়োজন করা হয়। উক্ত অধিবেশনে পৌরোহিত্য শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ সরকার (সঃ প্রঃ ঋঃ) । প্রার্থনান্তে শ্রীশ্রীঠাকুরের শ্রীহস্তলিখিত সত্যানুসরণ পাঠ করেন শ্রীউত্তমচন্দ্র দে (যাজক), শ্রীশ্রীঠাকুরের মহাভাব-বাণী পুণ্য-পুঁথি পাঠ করেন শ্রীসুরঞ্জন দে সৌরভ (স্বস্ত্যয়নী)। শ্রীশ্রীঠাকুরের ভক্তিগীতি পরিবেশন করেন শ্রীগোপেন্দ্রচন্দ্র দে (সঃ প্রঃ ঋঃ), শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ সরকার (সঃ প্রঃ ঋঃ), শ্রীকমল দাশ। অধিবেশনে স্থানীয় কর্মী সভা অনুষ্ঠিত হয়, ঐ কর্মী সভায় শ্যামারচর আঞ্চলিক শাখা সৎসঙ্গ আশ্রমের উন্নয়নমূলক বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা করা হয়। পাশাপাশি শ্রীশ্রীঠাকুরের বাণীর আলোকে আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ সরকার (সঃপ্রঃঋঃ), শ্রীগোপেন্দ্রচন্দ্রদে (সঃ প্রঃ ঋঃ), ডাঃ শ্রীবাদল রায়চৌধুরী, শ্রীনিশিকান্ত রায়চৌধুরী (চানু), ডাঃ সুমন রায়, শ্রীউত্তমচন্দ্র দে(যাজক), শ্রীসুরঞ্জন দে সৌরভ (স্বস্ত্যয়নী), আরও অনেকে। সব শেষে আনন্দবাজারের মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হয়।

সংবাদদাতা–শ্রীউত্তমচন্দ্র দে(যাজক)।

গত ১লা বৈশাখ ১৪২৪ বাংলা রোজ শনিবার, দিরাই উপজেলার শ্যামারচর নিবাসী শ্রীশ্যামলচন্দ্র দে (সৎসঙ্গী) মহোদয়ের বাসগৃহে নববর্ষ উপলক্ষে এক সৎসঙ্গ অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত অধিবেশনে পৌরোহিত্য করেন শ্রীগোপেন্দ্রচন্দ্র দে (সঃপ্রঃঋঃ) ।শ্রীশ্রীঠাকুরের শ্রীহস্থলিখিত সত্যানুসরণ পাঠ করেন শ্রীরুপমচন্দ্র দে, শ্রীশ্রীঠাকুরের পুণ্য-পুঁথি পাঠ করেন শ্রীসবিনয় সরকার । এরপর শ্রীশ্রীঠাকুরের ভক্তিমূলক গান পরিবেশন করা হয় ।

শ্রীশ্রীঠাকুরের বাণীর আলোকে আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন– শ্রীগোপেন্দ্রচন্দ্রদে (সঃ প্রঃ ঋঃ), শ্রীমনোরঞ্জন দাস (স্বস্ত্যয়নী), শ্রীসুরঞ্জন দে সৌরভ (স্বস্ত্যয়নী), শ্রীসবিনয় সরকার, শ্রীরুপম দে। সব শেষে আনন্দবজারের মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হয়।

সংবাদদাতা- শ্রীউত্তমচন্দ্র দে (যাজক)।

গত ৩১/০৩/২০১৭ খ্রিষ্টাব্দ, শুক্রবার, দিরাই উপজেলার চরনারচর ইউনিয়নের আলীপুর নিবাসী শ্রীমনোরঞ্জন দাশ (স্বস্ত্যয়নী) মহোদয়ের বাড়ীতে, পরমপ্রেমময় শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্রের শুভ ১২৯ তম আবির্ভাব-বর্ষ-স্মরণ মহোৎসব উদ্‌যাপিত হয়। উক্ত মহোৎসবে পৌরোহিত্য করেন শ্রীগোপেন্দ্রচন্দ্র দে (সঃপ্রঃঋঃ)। বিভিন্ন কর্মসূচীর মাধ্যমে মহোৎসব আনন্দে মুখরিত হয়ে ওঠে। সকাল-সন্ধ্যা প্রার্থনান্তে শ্রীশ্রীঠাকুরের সদ্‌গ্রন্থাদি পাঠ করেন শ্রীউত্তমচন্দ্র দে (যাজক) । শ্রীশ্রীঠাকুরের ভক্তিমূলক গান পরিবেশন করেন শ্রীমনোরঞ্জন দাশ (স্বস্ত্যয়নী), শ্রীকমল দাশ, আরও অনেকে। বিকালে শ্রীশ্রীঠাকুরের জীবনী ও বাণীর আলোকে ধর্ম্মসভায় আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন শ্রীগোপেন্দ্রচন্দ্র দে (সঃ প্রঃ ঋঃ), শ্রীহেমেন্দ্রচন্দ্র দে, শ্রীমনোরঞ্জন দাশ (স্বস্ত্যয়নী), শ্রীউত্তমচন্দ্র দে (যাজক)। ঐ দিন কয়েক জন শ্রীশ্রীঠাকুরের সৎ নামে দীক্ষা গ্রহণ করেন। সবশেষে আনন্দবাজারের মহাপ্রসাদ বিতরণের মধ্যে দিয়ে মহোৎসবের সমাপ্তি ঘটে।

সংবাদদাতাঃ- শ্রীউত্তম চন্দ্র দে (যাজক)।

সন্দীপনায় যে কোন লেখা পাঠাতে এই মেইল নাম্বারগুলোতে পাঠান–

E-mail: tapas.satsang@gmail.com
tkroy@rocketmail.com

প্রার্থনার সময়সূচি

(বাংলাদেশ সময়ানুসারে প্রাতঃকালীন প্রার্থনা সূর্যোদয়ের ৩০ মিনিট পূর্বে এবং সন্ধ্যাকালীন প্রার্থনা সূর্যাস্তের সাথে সাথে)

মাসের	তারিখ	১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪	২৫	২৬	২৭	২৮	২৯	৩০	৩১
নাম	সময়																															
জানুয়ারি	প্রাতঃ	৬.২২	৬.২২	৬.২২	৬.২৩	৬.২৩	৬.২৩	৬.২৩	৬.২৪	৬.২৪	৬.২৪	৬.২৪	৬.২৪	৬.২৪	৬.২৪	৬.২৫	৬.২৫	৬.২৫	৬.২৫	৬.২৫	৬.২৫	৬.২৫	৬.২৫	৬.২৫	৬.২৫	৬.২৪	৬.২৪	৬.২৪	৬.২৩	৬.২৩	৬.২৩	৬.২২
	সন্ধ্যা	৫.২৮	৫.২৮	৫.২৯	৫.৩০	৫.৩০	৫.৩১	৫.৩২	৫.৩২	৫.৩৩	৫.৩৪	৫.৩৪	৫.৩৫	৫.৩৫	৫.৩৬	৫.৩৭	৫.৩৭	৫.৩৮	৫.৩৯	৫.৩৯	৫.৪০	৫.৪০	৫.৪১	৫.৪২	৫.৪২	৫.৪৩	৫.৪৪	৫.৪৫	৫.৪৬	৫.৪৬	৫.৪৭	৫.৪৮
ফেব্রুয়ারি	প্রাতঃ	৬.২২	৬.২১	৬.২১	৬.২১	৬.২০	৬.২০	৬.২০	৬.১৯	৬.১৮	৬.১৭	৬.১৭	৬.১৭	৬.১৬	৬.১৬	৬.১৫	৬.১৪	৬.১৪	৬.১৩	৬.১২	৬.১১	৬.১১	৬.১০	৬.০৯	৬.০৮	৬.০৭	৬.০৬	৬.০৬	৬.০৫			
	সন্ধ্যা	৫.৪৯	৫.৪৯	৫.৫০	৫.৫০	৫.৫১	৫.৫২	৫.৫২	৫.৫৩	৫.৫৪	৫.৫৪	৫.৫৫	৫.৫৫	৫.৫৬	৫.৫৬	৫.৫৭	৫.৫৭	৫.৫৮	৫.৫৯	৫.৫৯	৬.০০	৬.০০	৬.০১	৬.০২	৬.০২	৬.০২	৬.০৩	৬.০৪	৬.০৪			
মার্চ	প্রাতঃ	৬.০৪	৬.০৩	৬.০২	৬.০১	৬.০০	৫.৫৯	৫.৫৮	৫.৫৭	৫.৫৬	৫.৫৫	৫.৫৪	৫.৫৪	৫.৫৩	৫.৫২	৫.৫১	৫.৫০	৫.৪৯	৫.৪৮	৫.৪৭	৫.৪৬	৫.৪৫	৫.৪৪	৫.৪৩	৫.৪২	৫.৪১	৫.৪০	৫.৩৯	৫.৩৮	৫.৩৭	৫.৩৬	৫.৩৫
	সন্ধ্যা	৬.০৫	৬.০৫	৬.০৬	৬.০৬	৬.০৭	৬.০৭	৬.০৮	৬.০৮	৬.০৮	৬.০৯	৬.০৯	৬.১০	৬.১০	৬.১১	৬.১১	৬.১১	৬.১২	৬.১২	৬.১২	৬.১৩	৬.১৩	৬.১৪	৬.১৪	৬.১৫	৬.১৫	৬.১৫	৬.১৬	৬.১৬	৬.১৬	৬.১৭	৬.১৭
এপ্রিল	প্রাতঃ	৫.৩৪	৫.৩৩	৫.৩২	৫.৩১	৫.৩০	৫.২৯	৫.২৮	৫.২৭	৫.২৬	৫.২৫	৫.২৫	৫.২৩	৫.২২	৫.২১	৫.২১	৫.২০	৫.১৯	৫.১৮	৫.১৭	৫.১৬	৫.১৫	৫.১৫	৫.১৪	৫.১৩	৫.১২	৫.১২	৫.১১	৫.১০	৫.১০	৫.০৯	
	সন্ধ্যা	৬.১৮	৬.১৮	৬.১৮	৬.১৯	৬.১৯	৬.২০	৬.২০	৬.২০	৬.২১	৬.২১	৬.২২	৬.২২	৬.২২	৬.২৩	৬.২৩	৬.২৩	৬.২৪	৬.২৪	৬.২৪	৬.২৫	৬.২৫	৬.২৬	৬.২৬	৬.২৭	৬.২৭	৬.২৭	৬.২৮	৬.২৮	৬.২৮	৬.২৯	
মে	প্রাতঃ	৫.০৮	৫.০৮	৫.০৭	৫.০৬	৫.০৬	৫.০৫	৫.০৪	৫.০৪	৫.০৩	৫.০৩	৫.০২	৫.০২	৫.০১	৫.০০	৫.০০	৪.৫৯	৪.৫৯	৪.৫৮	৪.৫৮	৪.৫৭	৪.৫৭	৪.৫৬	৪.৫৬	৪.৫৬	৪.৫৬	৪.৫৫	৪.৫৫	৪.৫৫	৪.৫৫	৪.৫৫	৪.৫৫
	সন্ধ্যা	৬.২৯	৬.৩০	৬.৩০	৬.৩০	৬.৩১	৬.৩১	৬.৩২	৬.৩২	৬.৩৩	৬.৩৩	৬.৩৪	৬.৩৪	৬.৩৫	৬.৩৫	৬.৩৬	৬.৩৬	৬.৩৭	৬.৩৭	৬.৩৮	৬.৩৮	৬.৩৯	৬.৪০	৬.৪০	৬.৪১	৬.৪১	৬.৪১	৬.৪২	৬.৪২	৬.৪২	৬.৪৩	৬.৪৩
জুন	প্রাতঃ	৪.৫৫	৪.৫৫	৪.৫৫	৪.৫৫	৪.৫৫	৪.৫৫	৪.৫৫	৪.৫৪	৪.৫৪	৪.৫৪	৪.৫৪	৪.৫৪	৪.৫৪	৪.৫৪	৪.৫৪	৪.৫৪	৪.৫৪	৪.৫৪	৪.৫৪	৪.৫৪	৪.৫৪	৪.৫৪	৪.৫৪	৪.৫৫	৪.৫৫	৪.৫৬	৪.৫৬	৪.৫৬	৪.৫৭	৪.৫৭	
	সন্ধ্যা	৬.৪৩	৬.৪৪	৬.৪৪	৬.৪৪	৬.৪৫	৬.৪৫	৬.৪৬	৬.৪৬	৬.৪৬	৬.৪৭	৬.৪৭	৬.৪৮	৬.৪৮	৬.৪৯	৬.৪৯	৬.৪৯	৬.৫০	৬.৫০	৬.৫১	৬.৫১	৬.৫২	৬.৫২	৬.৫২	৬.৫২	৬.৫২	৬.৫২	৬.৫২	৬.৫২	৬.৫২	৬.৫২	
জুলাই	প্রাতঃ	৪.৫৭	৪.৫৮	৪.৫৮	৪.৫৯	৪.৫৯	৫.০০	৫.০০	৫.০০	৫.০১	৫.০১	৫.০২	৫.০২	৫.০২	৫.০২	৫.০৩	৫.০৩	৫.০৩	৫.০৪	৫.০৪	৫.০৪	৫.০৫	৫.০৫	৫.০৫	৫.০৫	৫.০৬	৫.০৬	৫.০৭	৫.০৭	৫.০৮	৫.০৮	৫.০৯
	সন্ধ্যা	৬.৫২	৬.৫২	৬.৫২	৬.৫২	৬.৫২	৬.৫২	৬.৫২	৬.৫২	৬.৫২	৬.৫২	৬.৫২	৬.৫২	৬.৫২	৬.৫২	৬.৫২	৬.৫২	৬.৫১	৬.৫১	৬.৫১	৬.৫১	৬.৫১	৬.৫১	৬.৫১	৬.৫০	৬.৫০	৬.৫০	৬.৪৯	৬.৪৯	৬.৪৮	৬.৪৭	৬.৪৭
অগাস্ট	প্রাতঃ	৫.০৯	৫.১০	৫.১০	৫.১১	৫.১১	৫.১২	৫.১২	৫.১৩	৫.১৩	৫.১৩	৫.১৪	৫.১৪	৫.১৪	৫.১৫	৫.১৫	৫.১৬	৫.১৬	৫.১৬	৫.১৬	৫.১৭	৫.১৭	৫.১৭	৫.১৮	৫.১৮	৫.১৮	৫.১৯	৫.১৯	৫.১৯	৫.২০	৫.২০	৫.২০
	সন্ধ্যা	৬.৪৬	৬.৪৬	৬.৪৫	৬.৪৫	৬.৪৪	৬.৪৩	৬.৪৩	৬.৪২	৬.৪১	৬.৪১	৬.৪০	৬.৩৯	৬.৩৯	৬.৩৮	৬.৩৭	৬.৩৬	৬.৩৬	৬.৩৫	৬.৩৪	৬.৩৩	৬.৩৩	৬.৩২	৬.৩১	৬.৩০	৬.৩০	৬.২৯	৬.২৮	৬.২৭	৬.২৬	৬.২৫	৬.২৪
সেপ্টেম্বর	প্রাতঃ	৫.২১	৫.২১	৫.২২	৫.২২	৫.২২	৫.২৩	৫.২৩	৫.২৩	৫.২৪	৫.২৪	৫.২৪	৫.২৫	৫.২৫	৫.২৫	৫.২৫	৫.২৬	৫.২৬	৫.২৬	৫.২৭	৫.২৭	৫.২৭	৫.২৮	৫.২৮	৫.২৮	৫.২৯	৫.২৯	৫.২৯	৫.৩০	৫.৩০	৫.৩০	
	সন্ধ্যা	৬.২৩	৬.২২	৬.২১	৬.২০	৬.১৯	৬.১৭	৬.১৭	৬.১৬	৬.১৫	৬.১৪	৬.১৩	৬.১২	৬.১১	৬.১০	৬.০৯	৬.০৮	৬.০৭	৬.০৬	৬.০৫	৬.০৪	৬.০৩	৬.০২	৬.০১	৬.০০	৫.৫৯	৫.৫৮	৫.৫৭	৫.৫৬	৫.৫৫	৫.৫৪	
অক্টোবর	প্রাতঃ	৫.৩১	৫.৩১	৫.৩১	৫.৩২	৫.৩২	৫.৩২	৫.৩৩	৫.৩৩	৫.৩৪	৫.৩৪	৫.৩৪	৫.৩৫	৫.৩৫	৫.৩৬	৫.৩৬	৫.৩৬	৫.৩৭	৫.৩৭	৫.৩৮	৫.৩৮	৫.৩৯	৫.৩৯	৫.৪০	৫.৪০	৫.৪১	৫.৪১	৫.৪২	৫.৪২	৫.৪৩	৫.৪৩	৫.৪৪
	সন্ধ্যা	৫.৫৩	৫.৫২	৫.৫১	৫.৫০	৫.৪৯	৫.৪৮	৫.৪৭	৫.৪৬	৫.৪৫	৫.৪৪	৫.৪৩	৫.৪২	৫.৪১	৫.৪০	৫.৩৯	৫.৩৮	৫.৩৮	৫.৩৭	৫.৩৬	৫.৩৫	৫.৩৪	৫.৩৩	৫.৩৩	৫.৩২	৫.৩২	৫.৩০	৫.২৯	৫.২৯	৫.২৮	৫.২৭	৫.২৭
নভেম্বর	প্রাতঃ	৫.৪৪	৫.৪৫	৫.৪৫	৫.৪৬	৫.৪৭	৫.৪৭	৫.৪৮	৫.৪৮	৫.৪৯	৫.৫০	৫.৫০	৫.৫১	৫.৫২	৫.৫২	৫.৫৩	৫.৫৪	৫.৫৫	৫.৫৫	৫.৫৫	৫.৫৭	৫.৫৮	৫.৫৯	৫.৫৯	৬.০০	৬.০১	৬.০১	৬.০২	৬.০২	৬.০৩	৬.০৩	
	সন্ধ্যা	৫.২৬	৫.২৬	৫.২৫	৫.২৪	৫.২৪	৫.২৩	৫.২৩	৫.২২	৫.২২	৫.২১	৫.২১	৫.২০	৫.২০	৫.১৯	৫.১৯	৫.১৯	৫.১৮	৫.১৮	৫.১৮	৫.১৭	৫.১৭	৫.১৬	৫.১৬	৫.১৬	৫.১৬	৫.১৬	৫.১৬	৫.১৬	৫.১৬	৫.১৬	
ডিসেম্বর	প্রাতঃ	৬.০৪	৬.০৫	৬.০৫	৬.০৬	৬.০৭	৬.০৭	৬.০৮	৬.০৮	৬.০৯	৬.১০	৬.১০	৬.১১	৬.১২	৬.১৩	৬.১৩	৬.১৪	৬.১৫	৬.১৫	৬.১৬	৬.১৭	৬.১৮	৬.১৮	৬.১৯	৬.২০	৬.২০	৬.২০	৬.২১	৬.২১	৬.২১	৬.২১	৬.২২
	সন্ধ্যা	৫.১৬	৫.১৭	৫.১৭	৫.১৭	৫.১৭	৫.১৭	৫.১৭	৫.১৮	৫.১৮	৫.১৮	৫.১৮	৫.১৯	৫.১৯	৫.১৯	৫.১৯	৫.২০	৫.২০	৫.২০	৫.২০	৫.২১	৫.২১	৫.২১	৫.২১	৫.২২	৫.২২	৫.২৩	৫.২৪	৫.২৫	৫.২৫	৫.২৬	৫.২৭

প্রস্তুতকারক ঃ শ্রীঅসিতকুমার মণ্ডল (সহ-প্রতিঋত্বিক), সহযোগিতায় ঃ শ্রীঅরবিন্দকুমার মণ্ডল (যাজক), সাতক্ষীরা ।